সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

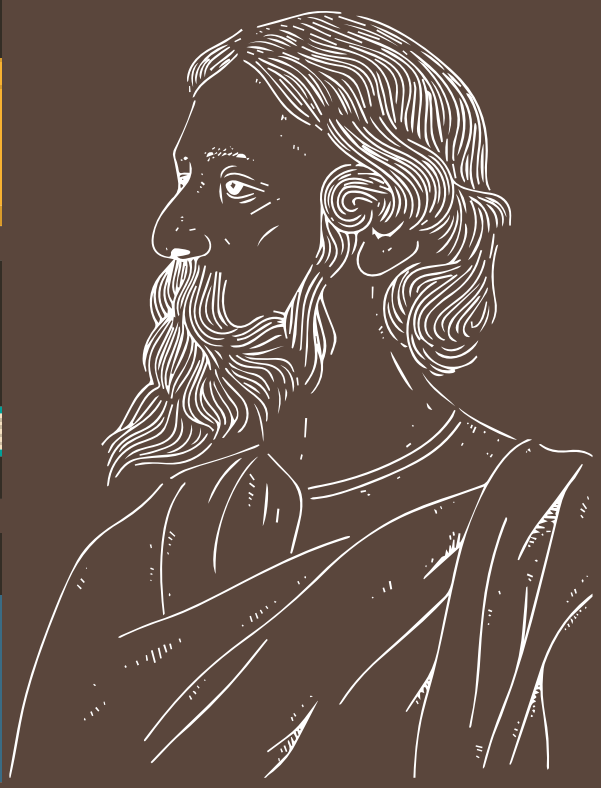

মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৪ • ১১তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সূচি

লাইব্রেরি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২
ছোট ভাই মোহাম্মদ ইয়াহিয়া - সুফিয়া আক্তার বেগম ৪
উন্নয়ন ও আদর্শের প্রজ্বলিত শিখা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া - মো. জাহিদুল ইসলাম ৬
ঋদ্ধি লাইব্রেরি - শামীমা দিশা ৮
স্থানীয় পাঠাগার 'নির্ঝরিণী' - সালমা খাতুন ৯
কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা এবং সমাধান - স্কোয়াড্রন লিডার আহসান (অব.) ১০
মেধাবীদের নিয়ে ঢাকঢোল, ব্যর্থতার বেলায় পিছটান! - অলোক আচার্য ১৪
কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম এর অনন্য স্থান টাঙ্গুয়ার হাওর - ইমরানুল আলম ১৫
সহযোগিতা ও সহনশীলতার জাপানি সূত্র গানবাত্তে কুদাসাই - এস এম মুকুল ১৬
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ ১৮
দেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যার্তদের পাশে সিদীপ ২১
এসএমএপি লোনে ঘুরে দাঁড়ালো নওপাড়ার লিপি বেগম - কিশোর কুমার ২২
তোমার বাস কোথা যে: বরিশাল - নিয়াজ আহামেদ অপু ২৫
বই ও গ্রন্থাগার আগামী দুনিয়ায় আমাদের পাসপোর্ট - আলমগীর খান ২৮

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি ⊕ irc.com.bd

সম্পাদকীয়

সিদীপের একটি অভিনব কর্মসূচি 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার'। গত দুই বছরে ১১টি জেলায় ৩০টি স্কুল-কলেজে এ কার্যক্রম চলমান। আমাদের সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুক্তপাঠাগার নিয়েই যে কেবল আমরা কাজ করি তা নয়। দেশের বিভিন্ন পাঠাগারের সঙ্গে আমরা যৌথ কার্যক্রমেও অংশ নেই, যার মধ্যে আছে পাঠাগার সম্মেলন, পাঠক সম্মিলন ইত্যাদি। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার নিয়ে আকর্ষণীয় লেখা নিয়মিত শিক্ষালোকে প্রকাশিত হয়। এবারও এমন দুটি পাঠাগারের কথা আছে ও আগামী সংখ্যাগুলোয়ও থাকবে।

আজকে বাংলাদেশে পাঠাগার নিয়ে যে উসাহ ও আগ্রহ তৈরি হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইব্রেরি নিয়ে লেখাটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আমরা এ চমৎকার লেখাটি এবার পুনর্মুদ্রণ করছি কারণ ছোট পরিসরে এখানে অসামান্য আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। জাতি গঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিরাট, এ বোধোদয় আমাদের যত তাড়াতাড়ি হবে ততই মঙ্গল।

এ বছর ছিল সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার (১ ডিসেম্বর ১৯৫০–২২ আগস্ট ২০২০) চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকী। দুটি লেখায় তাঁকে পুনরায় স্মরণ করা হলো। যেখানে দেখা যায় কী নিরঅহংকার, নিবেদিত সমাজসেবক, বইপ্রেমী ও দায়িত্বশীল একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন তিনি।

বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। এছাড়াও শিক্ষাসহ নানা বিষয় ও সিদীপের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন হয়েছে পুরো শিক্ষালোকে।

দেশে পরিবর্তনের এই নতুন প্রেক্ষাপটে ও সময়ের বাঁকে শুভানুধ্যায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছি এ সংখ্যাটি। নতুন কালের রূপকল্পের আমরাও সারথি।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ী নং- ২২/৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

লাইব্রেরি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব-হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব-হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে– কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ, সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবসমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

“
মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।

দেশ-বিদেশ হইতে, অতীত-বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে; আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব! সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকবে! জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব!

বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

ছোট ভাই মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

সুফিয়া আক্তার বেগম

"জন্মিলে মরিতে হয় জানিবে নিশ্চয়।" হ্যাঁ, আমিও জানি। কিন্তু মৃত্যু অনেক বেদনাদায়ক। কোনো কোনো মৃত্যু এতই বেদনাদায়ক যে জীবনের শেষ অবধি তা থেকেই যায়। ছোট ভাই মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার মৃত্যু তেমনই। দেখতে দেখতে চারটি বছর পার হয়ে গেল, তবুও যেন ইয়াহিয়ার মৃত্যুতে আমি অনেক কষ্ট পাই। জীবন সায়াহ্নে এসে আমারও আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু মৃত্যুর পর কি হবে তা ভেবে মরতেও ইচ্ছে করে না। আমি যখন দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ি বাংলার শিক্ষক অধ্যক্ষ মিন্নাত আলী স্যার আমাকে ক্লাশে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কতদিন বাঁচতে চাই। আমি বুক ফুলিয়ে বলেছিলাম, "মরিতে চাহিনা আমি এ সুন্দর ভুবনে।" আঠারো বছর বয়সে সেই উচ্ছ্বাস, সেই আনন্দ, সেই চপলতা কোথায় যে উবে গেল, জীবন সায়াহ্নে এসে এখন বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পাই না। এখন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি।

বলছিলাম ইয়াহিয়ার কথা। ইয়াহিয়ার জন্মের পর থেকে আমরা ভাই-বোনেরা সারাক্ষণ একসাথে থেকেছি। এক ঘরে থেকেছি, একসাথে খেয়েছি, একসাথে বড় হয়েছি, একসাথে খেলাধুলা করেছি। কত হাসি আনন্দের মাঝে দিন কেটেছে। তারপর ইয়াহিয়া অনার্স পড়তে ঢাকা চলে গেলেও চিঠি দিয়েছে, ভার্সিটি বন্ধ হলে বাড়িতে চলে এসেছে। সেটাও ছিল অন্যরকম আরো আনন্দের। এখন একবারে কোন কিছুতে ইয়াহিয়াকে পাই না, এ কষ্টটা মন থেকে যায় না।

যাক, ইয়াহিয়া আমাদের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য অনেক কিছু করে গেছে। অতি অল্প সময়ে মাত্র পঁচিশ বছরে সে এতকিছু কিভাবে করলো ভাবতে অবাক লাগে। তার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ছিল। তাই সে এতকিছু করতে পেরেছিল।

ইয়াহিয়ার কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে মাস্টার্স করার পর। প্রথমে কুমিল্লা বার্ডে এক বিদেশি শিক্ষকের সাথে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক গবেষণায় কাজ করে। এখান থেকেই সে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে উৎসাহী হয়ে উঠে। এরপর সে ও তার কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রশিকা নামে কুমিল্লায় একটি সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রশিকায় কাজ করার পর সে প্রথমে ইউএনডিপি ও পরে বিশ্বব্যাংকের চাকুরি নিয়ে বিদেশে চলে যায়। ১৯৯০ সালে জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায় থাকাকালীন তার হার্ট অ্যাটাক হয়। সেই যে অসুস্থ হয়েছে সেই অসুসস্থতা তাকে মৃত্যু পর্যন্ত নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। সারাটা জীবন সেই যন্ত্রণা নিয়ে ইয়াহিয়া অনেক কিছু করে গেছে।

১৯৯২ সালে দেশে এসে বিদেশে ঘুরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার উপর ভিত্তি করে নিজেই একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত তার প্রতিষ্ঠানের নাম সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)। এই এনজিও'র গর্বের কথা হলো বিদেশের কোন আর্থিক সাহায্য ছাড়াই বেসরকারি সেবামূলক এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। ইয়াহিয়ার সিদীপ শুধু ঋণদানকারী সংস্থাই নয়, বিভিন্ন উন্নয়ন সেবামূলক কাজও করে আসছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে এত বহুমুখী উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে শুধু তার অসীম সাহস, অদম্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও কাজ করার মানসিকতা থেকে। সে উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করে গেছে। আমি শুধু সিদীপের একটি স্লোগানের কথাই বলবো। সেটি হলো, "কোন গাঁয়ে কোনো কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর।" এই শ্লোগান থেকেই বুঝা যায় শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সিদীপের কতটা আগ্রহ। আর এই আগ্রহ পূরণের জন্য ইয়াহিয়া শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) নামে সারা বাংলাদেশের

আনাচে কানাচে অসংখ্য উঠান স্কুল প্রতিষ্ঠা করে গেছে। ইয়াহিয়ার এই যুগান্তকারী, অভিনব, ব্যতিক্রমী শিসক স্কুল অবশ্যই দেশের শিক্ষার হার উন্নত করতে এবং ছাত্রছাত্রীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে ভূমিকা রাখবে। গ্রামের যেসব ছেলেমেয়ের বাবা-মা লেখাপড়া জানে না, যারা তাদের সন্তানের প্রতিদিনের স্কুলের পড়াটা শিখিয়ে দিতে পারে না, শিসক সেইসব শিশুদের প্রত্যেকদিনের পড়াটা শিখিয়ে দিবে যাতে করে শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে। এই স্কুল চালানোর দায়িত্বটা থাকবে একজন গৃহবধূ অথবা কলেজ পড়ুয়া কোন ছাত্রীর।

শিসকে শুধু পড়াই শিখিয়ে দেয়া নয়। এখানে আছে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এতে করে ছোটবেলা থেকেই শিশুরা নাচ, গান, অভিনয়, কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পাবে। আছে প্রকৃতি পাঠ, যার মাধ্যমে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় প্রকৃতির সঙ্গে। আরও আছে প্রবীণ সংবর্ধনা। এতে করে শিশুরা শিশুকাল থেকেই বৃদ্ধদের সম্মান করতে শিখবে। এখানে বৎসরে একবার পিঠা উৎসব হয় যা দেশে প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে। পিঠা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্য। ইয়াহিয়া এ ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চেয়েছে। যেহেতু শিসকের স্কুলগুলো নারীদের দ্বারা পরিচালিত হয় তাই এটি নারী উন্নয়নের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তও। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কার্যক্রমের জন্য ২০১৫ সালে মাত্র দশ বছরে স্বীকৃতিস্বরূপ সিদীপ 'শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা' হিসেবে দশম Citi ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার লাভ করে। ইয়াহিয়া আরো একটি উৎসাহমূলক কাজ করে গেছে। সেটা হল সিদীপ পরিবারের কারো ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করলে তাকে উৎসাহস্বরূপ এককালীন কিছু টাকা দেওয়া হয়। শিক্ষার পিছনে এতকিছু করার একটাই লক্ষ্য ছিল, "কোন গাঁয়ে কোন ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর।" সিদীপের এই স্লোগান যেন বাস্তবে পরিণত হয়। মহান আল্লাহর কাছে এ দোয়াই করি।

ইয়াহিয়া উপলব্ধি করতে পেরেছিল শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সে তার প্রত্যেক ব্রাঞ্চ অফিসে স্বাস্থ্যসেবামূলক একটি কর্মসূচি যোগ করে। এখানে একজন ডাক্তার থাকবেন। এখানে যারা সেবা নিবেন প্রত্যেকে ২০০ টাকা দিয়ে একটি স্বাস্থ্যকার্ড করবেন এবং পরবর্তী এক বৎসর তার পরিবারের সবাই এ কার্ডের মাধ্যমে সেবা নিতে পারবেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। শিক্ষা প্রসারের জন্য সিদীপ থেকে "শিক্ষালোক" নামে একটি ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন বের হয়। এটাতে সফলতার অনেক গল্প থাকে যা পড়ে কর্মক্ষেত্রে অনেক উৎসাহ বাড়ে। যা পড়ে আমার নিজের কিছু করতে ইচ্ছা করে। জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি এ ম্যাগাজিন অনেক উৎসাহ দিয়ে থাকে।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজের চিন্তা তার ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে তার পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করে যেতে পারে নাই। বর্তমানে দেশের ৩০টি জেলায় ১৬৯টি উপজেলায় ২২৬টি শাখার মাধ্যমে ৩,১৭,১৭৪ জন সদস্য নিয়ে সিদীপের কার্যক্রম বিস্তৃত। ২০২১ সালে সেরা করদাতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সিদীপ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

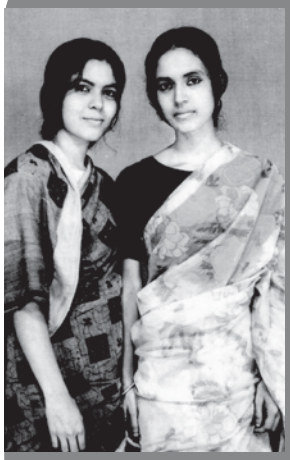

বড় বোন আশরাফুন নাহারের সাথে লেখক (বাম পাশে)

> "ইয়াহিয়া আমাদের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য অনেক কিছু করে গেছে। অতি অল্প সময়ে মাত্র পঁচিশ বছরে সে এতকিছু কিভাবে করলো ভাবতে অবাক লাগে। তার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ছিল। তাই সে এতকিছু করতে পেরেছিল

ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর ২০২২ সালে সিদীপ পরিবার তাদের প্রত্যেক ব্রাঞ্চে একটি করে উন্মুক্ত পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়। ইয়াহিয়ার নামানুসারে এই পাঠাগারের নাম রাখা হয় "মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার"। এ পর্যন্ত দেশের ১১টি জেলার ৩০টি বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। আমি এই পাঠাগারের সফলতা কামনা করি। কোন এক মনীষী বলেছেন, "কবরে বিশ্রামের অনন্ত অবসর রহিয়াছে, তাই ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে যত বেশি পারো কাজে লাগিয়ে নাও"। ইয়াহিয়া তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

২০২০ সালের ২২শে আগস্ট করোনায় আক্রান্ত হয়ে আমাদেরকে শোকসাগরে ভাসিয়ে ইয়াহিয়া পরপারে চলে গেছে। আমি ইয়াহিয়ার আত্মার শান্তি কামনা করি। মহান আল্লাহ্ যেন ইয়াহিয়াকে বেহেস্তবাসী করেন। আমিন।

লেখক: মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার বড় বোন

উন্নয়ন ও আদর্শের প্রজ্বলিত শিখা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

মো. জাহিদুল ইসলাম

যুগে যুগে পৃথিবীতে কিছু মানুষ জন্ম নেয়, যাদের নিজের জন্য চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকে না। তাঁরা নিজের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে নীরবে-নিভৃতে কাজ করে যান সাধারণ মানুষের জন্য, দেশের জন্য। যাদের মধ্যে না থাকে কোন লোভ-লালসা, না থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা। তেমনি একজন মানুষ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। চিন্তা-মনন ও সৃজনশীলতায় তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর আচার-ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অমায়িক এবং তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে একটা সহজ-শান্ত ভাব থাকতো। তিনি খুব সহজেই মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে আপন করে নিতেন।

২০০৯ সালের ২৪ জুলাই সিদীপে যোগদান করি। যোগদানের পর থেকেই স্যারের সান্নিধ্য পাই। প্রতিনিয়তই তাঁর সাথে চিঠিপত্র-রিপোর্ট ইত্যাদির কাজ করা হতো। একজন আদর্শ দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবে উনার মধ্যে সকল গুণই ছিল। তিনি ছিলেন আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ। সকল কাজেই ছিলেন খুবই সৎ ও মানবিক এবং একজন পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল মানুষ। নিজের মূল্যবোধ-বিশ্বাস ও জীবনবোধ দ্বারা অপরকে প্রভাবিত করতে পারতেন সহজেই। সহকর্মীদের প্রেষণা তৈরিতে সুনিপুণ সক্ষমতা ছিল তাঁর।

চিন্তা ও মননে ছিলেন অসম্ভব প্রগতিশীল একজন মানুষ। তিনি বই পড়তে ভালোবাসতেন। আমরা জেনেছি বিভিন্ন ছুটির দিনেও তিনি অফিসে আসতেন এবং দীর্ঘসময় বই পড়তেন। তিনি আমাদেরকেও বই পড়তে উৎসাহিত করতেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর এই গুণটি কিছুটা হলেও ধারণ করতে পেরেছি। তিনি লেখালেখি করতে ভালোবাসতেন এবং এ বিষয়ে অনন্য গুণের অধিকারী ছিলেন। মাঝে মধ্যেই আমাকে ডেকে নিয়ে একটা ডায়েরি দিয়ে বলতেন– জাহিদ, এই লেখাগুলো কম্পোজ করে দিয়ো আমাকে। লেখাগুলোর মধ্যে থাকতো কবিতা-গল্প, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা, শিক্ষা বিষয়ক লেখা, উন্নয়নমূলক লেখা ইত্যাদি। পরবর্তীতে তাঁর সেই লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশ পায়– কবিতার বই 'কষ্ট ও তার অতল ধ্বনি' এবং বিজ্ঞান কল্পকাহিনী 'মহাকাশে মহাজয়'।

সিদীপের শিক্ষাবিষয়ক বুলেটিনে শুরু থেকেই লেখালেখি করি। যখনই শিক্ষালোক সংখ্যা বের হতো ইয়াহিয়া স্যার ডেকে নিয়ে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, তোমার লেখা পড়েছি, খুব সুন্দর লিখেছো এবং নিয়মিত লেখালেখি করবে। তাঁর এই উৎসাহ আমার লেখালেখির আগ্রহকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

স্যার মানুষের সাথে মিশতে খুবই ভালোবাসতেন এবং সহজেই মানুষকে আপন করে নিতেন। তিনি সর্বদা মানুষের সাথে কথা বলতে ও মিশতে উপদেশ দিতেন। ১৯-২৬ অক্টোবর ২০১৯এ অফিস থেকে এক্সপোজার ভিজিটে নেপাল যাওয়ার সুযোগ পাই। ভিজিটে যাওয়ার আগে স্যার ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, অফিসিয়াল কাজে যাচ্ছো, অবশ্যই অফিসের কাজকে প্রাধান্য দিবে। তবে ট্যুরটি এনজয় করবে, বেশি বেশি মানুষের সাথে মিশবে, তাদের সাথে কথা বলবে। তাহলে তাদের চিন্তা-ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবে, তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং সেটাই হবে তোমার আসল জ্ঞান অর্জন। এছাড়া যখনই ফিল্ড ভিজিটে যাওয়ার সুযোগ হতো, তখন তিনি বলতেন– সিদীপকে জানতে হলে মাঠপর্যায়ে যেতে হবে, ফিল্ড অফিসারদের কাজ সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে হবে, সদস্যদের সাথে মিশতে হবে, তাদের সাথে কথা বলতে হবে। সদস্যরাই হলো সংস্থার প্রাণশক্তি।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর চিন্তা-চেতনায় ছিল প্রান্তিক জনসাধারণের উন্নয়ন এবং দেশের উন্নয়ন। সেই চিন্তা থেকেই তিনি পড়াশোনা শেষ করে কুমিল্লা বার্ড-এর সাথে

যুক্ত হয়ে যুক্তরাজ্যের এক প্রফেসর দম্পতির সাথে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের উপর গবেষণা কাজে সহকারী গবেষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমমনাদের নিয়ে 'প্রশিকা' গঠনে ছিলেন। পরবর্তীতে জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করে প্রায় পুরো পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। দেশে ফিরে তিনি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে 'গ্রামীণ ট্রাস্ট'-এ যুক্ত হন। সেখানে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করেন। প্রথম নির্বাহী পরিচালক হিসেবে মাইক্রোফাইন্যান্স পরিচালনাকারী সংগঠনগুলোর সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠান 'ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)'-এর যাত্রা শুরু হয় তার মাধ্যমে।

দেশে-বিদেশে দীর্ঘদিন চাকরি করলেও তার ভিতর লালিত স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দুঃসাহসের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস-(সিদীপ)' প্রতিষ্ঠা করেন। তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল, এর মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং তারা স্বাবলম্বী হয়ে সম্মানজনক জীবনযাপনে অগ্রসর হবে। তাঁর স্বপ্ন তাঁর হাত ধরেই পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

তাঁর মতে, উন্নয়ন হলো জীবনের একটি সামগ্রিক বিষয়, যা অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যগত ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। সেই লক্ষ্যে সিদীপ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি উদ্ভাবনীমূলক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সিদীপ 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি'র মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরেপড়া রোধে এক হাজার গ্রামে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য আড়াই হাজার 'উঠান স্কুল' প্রতিষ্ঠা করে অর্ধলক্ষ শিশুকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করছে। এ সকল উঠান স্কুলে পাঠদানের পাশাপাশি 'প্রকৃতি-পাঠ' কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের চারপাশের প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও মানুষের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অধীনে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের নৈতিক ও মানসিক বিকাশ ঘটছে। উঠান স্কুলগুলোতে বছরের শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সমাজের প্রবীণদেরকে সম্মাননা প্রদানের প্রচলন হয়। শুধু স্থানীয় শিক্ষিত গৃহবধূ ও শিক্ষিত বেকার তরুণীদের এই উঠান স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে অভিনব এই শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়ে 'কার্যকর মডেল' হিসাবে স্বীকৃতি পায়। 'আশা' এবং এনজিওদের সহায়তা প্রদানকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সারাদেশে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রান্তিক জনপদের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের দোরগোড়ায় স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার চিন্তায় তিনি ছিলেন উদগ্রীব। এ লক্ষ্যে প্রথমদিকে ব্রাঞ্চ পর্যায়ে একজন এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ দিয়ে চেষ্টা করেছেন। তবে তা সফল হয়নি। এরপর অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল হতে রেজিস্ট্রেশনকৃত ডিপ্লোমাধারী 'উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার' (স্যাকমো) নিয়োগ দিলেন। যারা প্রতিদিন কর্মএলাকার সর্বসাধারণের দোরগোড়ায় গিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করছেন। এ জন্য স্যাকমোদের প্রদান করা হয়েছে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ। স্বাস্থ্যসেবাকে নারীবান্ধব করার লক্ষ্যে একজন স্যাকমোর সাথে স্থানীয়ভাবে ৫ জন নারী হেলথ ভলান্টিয়ার নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যারা তাদের এলাকার মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসচেতনতা প্রদান করেন। বর্তমানে সিদীপের একটি সফল কর্মসূচি 'স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি'।

তিনি সর্বদাই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং সুযোগ পেলেই উন্নয়নমূলক কাজে লেগে যেতেন। পিকেএসএফ ও সিদীপের যৌথ অংশগ্রহণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কসবা উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নে এবং একই জেলায় নবীনগর উপজেলার রতনপুর ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি। তাঁর উদ্যোগেই পিকেএসএফ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ২০১৭ সালে আগস্ট মাসে মূলগ্রাম ইউনিয়নকে ভিক্ষুকমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া রতনপুর ইউনিয়নে গৃহহীনদের পুনর্বাসন করার জন্য সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে 'গৃহহীন পুনর্বাসন প্রকল্প'র আওতায় ঘর ও ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন উদার ও মুক্তমনা। সহজ ও সাবলীল কথাবার্তা এবং অমায়িক ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি সবাইকে খুব সহজেই জয় করে নিতেন। দীর্ঘ ১৫ বছরের চাকরিজীবনে আমি কখনোই তাকে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনিনি। তিনি সিদীপের সকল কর্মীর মাঝে এমন মনোভাব তৈরি করেছেন যে, প্রত্যেক কর্মীই সিদীপকে তার নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করেন। তিনি সবসময় বলতেন, "তোমরা সিদীপকে দেখো, আমি তোমাদের পরিবারকে দেখব।" চিন্তায় ও মননে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ অভিভাবক। উন্নয়ন ও আদর্শের এক প্রদীপশিখা জ্বেলে গেছেন তিনি। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন, আমিন।

লেখক: প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা

ঋদ্ধি লাইব্রেরি

শামীমা দিশা

ঋদ্ধি লাইব্রেরি নামটা শুনেই প্রথমে চমকে উঠলাম কারণ আমার কন্যার নাম ঋদ্ধি। কাজিন মোহাম্মদ জাহিদ বাবু একদিন বললেন, আপা মিরপুর বারো নম্বর ঋদ্ধি নামে একটা নতুন লাইব্রেরি হয়েছে, ওখানে যাবো।

মোহাম্মদ জাহিদ বাবুর কথামতো আমি মিরপুর ১২ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের আশেপাশে খোঁজখবর করা শুরু করি। অলিগলি খুঁজে যখন পেলাম না তখন রাস্তায় ফুটপাতে চায়ের দোকানে বসা ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করলাম। ওরা ওয়েট বলেই গুগল ম্যাপে সার্চ দিয়ে লোকেশানটা বের করে আমায় জানালো, ঋদ্ধি লাইব্রেরি মিরপুর ১১ নম্বর মেট্রোরেল স্টেশনের পাশে ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালের কাছাকাছি দেখাচ্ছে। সেদিন আমার আর সময় হলো না। দু'দিন পর জাহিদ বাবু আবারও আমায় ফোন করে বললো, আপা আপনি ফ্রি থাকলে আজ বিকেলে আমরা ঋদ্ধি লাইব্রেরিতে যাবো।

আমরা লাইব্রেরিটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখানে আছে চমৎকার একটা মনোরম পরিবেশ। গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছে ক্যাফে, ফার্স্ট ফ্লোরে লাইব্রেরি, সেকেন্ড ফ্লোরে আর্ট গ্যালারি। মাঝেমধ্যে এখানে কালচারাল প্রোগ্রাম করা হয়। অনেক ছেলেমেয়ে এখানে বই পড়তে আসছে। দর্শনের বইয়ের জন্য আলাদা একটা কর্নার আছে, শিশু কিশোরদের জন্য আছে আলাদা কক্ষ, একজন মাকে দেখলাম তার শিশু সন্তানকে নিয়ে এসেছেন। সব বয়সের লোক আসেন এখানে তবে তরুণদের সংখ্যাটাই বেশি।

এরপর আমি আবারও আরেকদিন গেলাম আমার লেখক বন্ধু আরিফ ও জেবাকে নিয়ে। লাইব্রেরি ঘুরে আমরা ক্যাফেতে বসে কিছু স্ন্যাক্স খেতে বসতেই ভেসে এলো গিটার ও গানের সুর, বারান্দায় কয়েকজনের একটা গানের আসর বসেছে।

পরদিন আমি প্রফেসর আফজাল রহমান স্যারকে ফোন করে ঋদ্ধি লাইব্রেরির কথা জানালাম, কারণ পাঠাগার আন্দোলনের অংশ বিশেষে আমরা সারাদেশে লাইব্রেরিগুলোর সন্ধান করছি, লাইব্রেরিগুলো সচল রাখা এবং ছাত্রছাত্রীদের বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে পাঠাগারগুলোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কয়েকদিন আগে আমরা রূপনগর সৃষ্টি পাঠোদ্যানে গিয়েছিলাম, এর আগে

ঋদ্ধি লাইব্রেরিতে লেখিকা

মিরপুর ১২ নম্বর সি ব্লকে আত্মবিকাশ পাঠচক্রে গিয়েছিলাম। পাঠাগারগুলোতে কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক বই দেয়ার পরিকল্পনাও আছে আমাদের।

শোনা মাত্রই প্রফেসর আফজাল রহমান স্যার বললেন, তুমি আজই চলে আসো, আমরা ঋদ্ধি লাইব্রেরি ভিজিট করবো। স্যারের সাথে সেদিন আবারও ঋদ্ধি লাইব্রেরিতে গেলাম। লাইব্রেরি ঘুরে ঘুরে স্যার দেখলেন, দুই-একটা বই নিয়ে কিছুক্ষণ পড়লেন।

এরপর আমরা ঋদ্ধি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা জনাব মাহবুবুল হাসান ফয়সালের সাথে অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ করি। আন্তরিকতার সাথেই উনি আমাদের গ্রহণ করলেন। আমি ওনাকে আমার লেখা দুটো বই গিফট করলাম। আমরা প্রায় চল্লিশ মিনিট ওনার সাথে কথা বলি। মাহবুবুল হাসান ফয়সাল সাহেব ভীষণ বইপড়ুয়া মানুষ, ওনার ফাইল থেকে বেশকিছু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কালেকশন উনি আমাদের দেখালেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, খুব চমৎকার একটি পাঠাগার উনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

লেখক: কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মী

স্থানীয় পাঠাগার 'নির্ঝরিণী'

সালমা খাতুন

মেধা ও মনন এবং নৈতিকতা সমৃদ্ধ মেধাবী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে পাঠাগারের ভূমিকা অপরিসীম। পাঠাগার হলো সমাজ উন্নয়নের বাহন। পাঠাগার অতি সহজেই একটি ইতিবাচক ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করতে সক্ষম। এজন্য সমাজে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। বর্তমানে আধুনিকায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় এসেছি আমরা সবাই। এর যেমন সুফল রয়েছে তেমনি অনেক কুফলও। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজ ও নতুন প্রজন্ম। তরুণ সমাজ ও নতুন প্রজন্মকে অপসংস্কৃতি, অপরাধ, মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধসহ নানা অপরাধ হতে রক্ষা করতে সমাজে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

একটি স্থানীয় পাঠাগার: পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদের ভেতরে রয়েছে ছোট্ট একটি পার্ক। নানা গাছগাছালিতে ভরা। রয়েছে বসার সুন্দর জায়গা। শিশুদের জন্য রয়েছে দোলনাসহ নানা উপকরণ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই নানা বয়সী মানুষ আসে এখানে সময় কাটাতে। এমন মনোরম পরিবেশে স্থাপন করা হয়েছে একটি উন্মুক্ত লাইব্রেরি। লাইব্রেরির নাম "নির্ঝরিণী"। "নির্ঝরিণী" শব্দের অর্থ প্রবাহী নদী। মানুষকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে ভাংগুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খানের উদ্যোগে ব্যতিক্রমধর্মী উন্মুক্ত এ লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। ছায়াঘেরা, পাখিডাকা মনোরম পরিবেশে স্থাপিত উন্মুক্ত এ লাইব্রেরি ইতিমধ্যে এলাকার বইপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অসাধারণ নির্মাণশৈলীর এ লাইব্রেরি দেখে মুগ্ধ হচ্ছে দর্শনার্থীরা। লাইব্রেরি চত্বরে স্থাপন করা হয়েছে সিসি ক্যামেরা। রাতের বেলায় রয়েছে আলোর ব্যবস্থা। উন্মুক্ত এ লাইব্রেরি দিনরাত ২৪ ঘন্টা পাঠকের জন্য খোলা থাকে।

পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠার বছর ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: নির্ঝরিণী প্রতিষ্ঠিত হয় ২০২২ সালের ১৭ এপ্রিল। ইউএনও মহোদয়ের সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পারি, উনি নিজেও একজন বইপ্রেমী মানুষ এবং উন্মুক্ত লাইব্রেরি 'নির্ঝরিণী'র নিয়মিত পাঠক। তার মতে, সম্পদ দান করলে ফুরানোর সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু বিদ্যা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। তিনি আরো বলেন, ভাংগুরা উপজেলার ভিতরে সুন্দর যে শিশু পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে, এখানে ছোটবড় সব বয়সের মানুষ ঘুরতে আসে, তারা অতি সহজেই উন্মুক্ত লাইব্রেরি নির্ঝরিণী থেকে বই নিয়ে পড়তে পারেন। বইপ্রেমী যে কোন মানুষ তাদের সুবিধামতো এসে একান্ত পরিবেশে বসে তাদের জ্ঞান আহরণ করতে পারেন।

পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা: নির্ঝরিণী দিনেদিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের পাঠক আসছেন এই লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে রয়েছে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন লোকের গল্প, উপন্যাস, রম্য-রচনা, রোমান্টিক উপন্যাস, প্রবন্ধ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিশুতোষ ও ধর্মীয়সহ প্রায় পাঁচ শতাধিক বই। পাঠকদের বসবার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন স্থান। পাঠকের জন্য ২৪ ঘণ্টাই উন্মুক্ত রাখা হয়েছে লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে দিনে পাঠকের সংখ্যা ৫০ জন করে দেখা যায়।

পাঠাগারটি নিয়ে ফাতেমা ফেরদৌস ফেন্সি নামের একজন ছাত্রী বলেন, আমি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত নিজ জন্মস্থান পাবনা জেলার ভাংগুরা থানায় সৌন্দর্যমণ্ডিত একখানা লাইব্রেরি দেখে। জ্ঞান অর্জনের প্রধান ও প্রথম উপায় হলো পড়া। এই লাইব্রেরি আমাদের হৃদয়ে দোলা দেয় বই পড়ার তাগিদ দিয়ে।

পরিশেষে বলতে চাই, মননশীলতার চর্চা করতে হলে বই পড়ার বিকল্প নেই। মানুষের মধ্যে বই পড়ার তৃষ্ণা মেটাতে স্থানীয় এই উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক: সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার, ভাঙ্গুড়া, পাবনা

কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা এবং সমাধান

স্কোয়াড্রন লিডার আহসান (অব.)

ভ্রূণরূপে মায়ের গর্ভে ধারণ করা থেকে শুরু করে বার্ধক্যের শেষে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত যে মানব অস্তিত্ব তার নাম জীবন। এই জীবন প্রথমদিকে থাকে ক্রমবিকাশমান এবং পরে হয় ক্রমক্ষীয়মান। মানব জীবন মাতৃগর্ভকাল থেকে শুরু করে ২৩-২৫ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে বাড়ে এবং তারপর থেকে শুরু হয় ক্রমক্ষয়, যা শেষ হয় মৃত্যুতে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানব জীবনকে মোটামুটি ৬ ধাপে ভাগ করা যায়- ১. মাতৃগর্ভকাল, ২. শৈশব, ৩. কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি, ৪. যৌবন, ৫. প্রৌঢ় এবং ৬. বার্ধক্য

সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন এবং দীর্ঘায়ু লাভের জন্য প্রতিটি ধাপ সম্বন্ধে জানার বা সচেতন থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। তারই অংশ হিসেবে এখানে আলোচ্য বিষয় মানব জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় কালরূপে গণ্য কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি ।

কৈশোর

শৈশব এবং যৌবনের মাঝখানে কৈশোর মানব জীবনের ক্রমবিকাশের এক ক্রান্তিকাল। কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকাল প্রায় একই সময় শুরু হয় কিন্তু এক নয়। উভয় ধাপের শুরুটা নির্ভর করে বংশগতি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টির ওপর। আমাদের দেশে ছেলে-মেয়েদের কৈশোর শুরু হয় ৯-১২ বছর বয়স থেকে এবং স্থায়ী হয় ১৫-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর শুরু হয় যৌবনকাল।

কৈশোরে ব্যক্তির দৈহিক বৃদ্ধির পাশাপাশি বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশ শুরু হয়। পরিবারের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে কার্যত আর্থিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে আত্মনির্ভরশীল বা স্বাধীন ব্যক্তি হওয়ার সংগ্রামী জীবন পর্বের যাত্রা শুরু। তবে এটা ব্যক্তির পারিবারিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। দৈহিক ক্রমবৃদ্ধির পরিসমাপ্তি ঘটে ২৩-২৫ বছরে। তারপর থেকেই শুরু হয় দৈহিক ক্রমক্ষয়। প্রথম দিকে (২৫-৩০) ধীরে এবং প্রৌঢ়কাল থেকে দ্রুত গতিতে। তবে জীবনের কর্ম অভিজ্ঞতা থেকে বৌদ্ধিক ও মানসিক পরিপক্কতা বাড়ে।

বয়ঃসন্ধি

বয়ঃসন্ধি শারীরিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্ক (পিটুইটারি গ্ল্যান্ড) থেকে নারী শিশুর ডিম্বাশয়ে ও নর শিশুর অণ্ডকোষে হরমোনের (এন্ড্রোজেন ও এস্ট্রোজেন) মাধ্যমে সংকেত পাঠাতে শুরু করে। এতে নর ও নারী শিশুর হাড়, মাংসপেশী, ত্বক, চুল, স্তন এবং যৌনাঙ্গসহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি, কার্যকারিতা এবং রূপান্তর ঘটে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি শৈশব ছেড়ে যৌন প্রজননে সক্ষম প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হয়। বয়ঃসন্ধির প্রথম দিকে দৈহিক উচ্চতা ও ওজন খুব দ্রুত বাড়তে থাকে।

বয়ঃসন্ধিকাল খুবই সংক্ষিপ্ত সময়। শুরু হয় ৯-১০ বছর বয়সে এবং পূর্ণ হয় ১৫-১৭ বছর বয়সে। বাংলাদেশে ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জীবনে এই ধাপ অতিক্রম শুরু হয়। এ সময় ছেলে-মেয়েদের প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলোর ক্রমবিকাশ স্পষ্ট হতে থাকে। মেয়েদের পরিবর্তন শুরু হয় ছেলেদের চেয়ে এক বছর আগে। তবে সকল পরিবর্তন নির্ভর করে বংশগতি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টির ওপর।

বয়ঃসন্ধির লক্ষণসমূহ

এ সময় ছেলে-মেয়ে উভয়ে ধাঁই করে লম্বা হয়ে যায়। ওজনও বেড়ে যায়। মেয়েদের প্রজননতন্ত্র (স্তন, জরায়ু, ডিম্বাধার ফেলপিয়ান টিউব ইত্যাদি) বাড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর ভারী হতে থাকে এবং উরু বা কটি ও স্তন স্ফীত হতে থাকে। মাসিক/রজঃস্রাব শুরু হয় এবং দেহের ভেতরে ডিম্বাধারে ডিম্বকোষ বা ডিম্বানু তৈরি শুরু হয়। এটাই মেয়েশিশুর মা হওয়ার প্রস্তুতি।

ছেলেদের কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যায় এবং মোটা হতে থাকে। মাংসপেশী দৃঢ়ভাবে বাড়তে থাকে। শিশ্ন ও অণ্ডকোষ বড় হতে থাকে। দেহে শুক্রকোষ/শুক্রানু তৈরি হয়। বীর্যপাত ও স্বপ্নদোষ শুরু হয়। এটা ছেলেশিশুর বাবা হওয়ার প্রস্তুতি।

ছেলে ও মেয়ে উভয়ের যৌনাঙ্গের আশপাশ সহ দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে চুল গজাতে থাকে। ছেলেদের বুকসহ সারা অঙ্গে এক ধরনের পশম গজাতে থাকে। মেয়েদের দেহ কমনীয় হয়ে ওঠে। হরমোনের কারণে মেয়েদের শরীর থেকে মেয়েলি গন্ধ এবং ছেলেদের শরীর থেকে পুরুষালি গন্ধ প্রকটভাবে ছড়াতে থাকে। উভয়ের নরম চামড়া ভেদ করে, বিশেষ করে মুখে ফুসকুড়ি বা ব্রণ উঠতে থাকে। এই দ্রুতগতির বিকাশের সঙ্গে তাল

সামলানো ছেলেমেয়েদের পক্ষে কঠিন হয় বা প্রায়ই পারা যায় না। তাই তারা মানসিক সমস্যায় পড়ে এবং অভিভাবকদেরও সমস্যায় ফেলে।

কৈশোর ও বয়ঃসন্ধির সমস্যা

দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগা: এসময় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ের মনে অনেক রকম প্রশ্ন জাগে, আশঙ্কা জাগে, ভয়ভীতি সঞ্চারিত হয়, উদ্বেগ কাজ করে। কেন করে, তার কারণ নিজেও বোঝে না বা কাউকে সহজে বুঝিয়েও বলতে পারে না। এটা হরমোনের কাজ। নতুনের প্রতি কৌতুহল বাড়ে। অজানাকে জানতে চায়। অচেনাকে চিনতে চায়। যিনি বা যারা তাকে বুঝতে চান এবং তার প্রতি সহানুভূতি দেখান, তিনি বা তাদের কাছেই সে আব্দার করে, প্রশ্ন করে বা জানতে চায়।

অবাধ্যতা: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৈশোর শুরু হয় আগে। এ সময় মা-বাবার চোখে পড়ে যে, তাদের সন্তান 'মুখে মুখে কথা বলে', সমালোচনামুখর এবং অভিযোগমুখী হয়। নিজের মনমতো না হলে মা-কিংবা বাবাকেও সহ্য করতে পারে না। বড়দের আদেশ/অনুরোধ/পরামর্শ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অমান্য করতে চায় বা করেও।

বহির্মুখিতা: মা-বাবা, ভাইবোনের চেয়ে সমবয়সী বন্ধুদের প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকে। সবকিছুর সীমা তলিয়ে দেখতে চায়; ভাল-মন্দ ও সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে ভাবে না। ঘর ছেড়ে দূরে চলে যেতে চায়। বৈধভাবে সুযোগ না পেলে পালায়। এগুলো কৈশোর শুরু হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ। কিন্তু এর সঙ্গে যদি বয়ঃসন্ধি যুক্ত হয়, তবে আগুনে ঘি ঢালার মতো কৈশোরের রূপান্তরটা খুবই তীব্র আবেগাক্রান্ত এবং জটিল রূপ ধারণ করে।

মানসিক দ্বন্দ্ব: বয়ঃসন্ধি একের ভেতর দুই সমস্যা সৃষ্টি করে। এক. দেহে যে পরিবর্তনগুলো শুরু হয়েছে তা কিভাবে সামাল দিবে। এটি ব্যক্তির আত্মসচেতন মনকে দগ্ধ করে। ব্যক্তিত্বকে বিচলিত ও অস্থির করে। দুই. আত্মপ্রকাশের সমস্যা– সে যে এখন বীর্যবান পুরুষ বা সোমত্ত নারী, এটা কিভাবে প্রকাশ করবে? এতকাল যারা তাকে ছোট বা অপরিপক্ক মনে করে আসছে সে যে এখন তা আর নয়, তাদের কাছে এটা কিভাবে প্রমাণ করবে? আবার পাকামো যেন না হয় সে বদনাম কিভাবে ঘোচাবে? এসব দ্বিধা-দ্বন্দ্বও তার ব্যক্তিত্বকে অস্থির করে তোলে। এটি মূলত তার একজন নারী বা পুরুষ-এর যথার্থ ভূমিকা পালন করার সমস্যা।

আত্মমর্যাদাবোধ: আত্মসচেতনতার দিক থেকে বলতে গেলে বহু ছেলে-মেয়ে/ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বয়ঃসন্ধিটা খুব দুঃসময়। এ সময় (৯-১৩ বৎসর) শৈশবের নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে সমাজে সমবয়সী বন্ধুদের মাঝে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠা পেতে তীব্র বাসনা হয়। তার দেহটা যেমন বাঁধ ভেঙ্গে উপচে পড়ে, তেমন মনও চলতে চায় স্বাধীনতার সাগরে গা ভাসিয়ে উজানে। তার এই চলার পথে যে বাধা দেয়, সেই হয় তখন তার শত্রু, বিশেষ করে বেবুঝ ও পশ্চাদপদ মা-বাবা। তাই তাদেরকে বলতে শোনা যায় "মা তুমি সেকেলে, এসব বুঝবে না বা মা তুমি না কিচ্ছু জানো না"। আর বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের বুঝতে ব্যর্থ হয়ে বলেন ছেলেটা/মেয়েটা বেয়াড়া/বেয়াদব, বেপরোয়া ইত্যাদি।

কৈশোরের বড় হতে থাকা এবং নিরাপত্তহীনতাবোধ হাতে হাত রেখে চলে। বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে/ছাত্র-ছাত্রীর কাছে বয়ঃসন্ধিকালটা আত্মসম্মানবোধের শত্রু। যখন তার দেহ বাড়তে থাকে তখন সামাজিকভাবে সে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার মুখোমুখি হয়। দেহের আকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যাবলি নাজুক বলে অনুভব করে। একান্ত সঙ্গোপনে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, বিশেষ করে বাথরুমে আয়নার সামনে। কোন পরিবর্তনটা কিভাবে হচ্ছে, কোথাও ত্রুটি রইল কি না! বিকাশ বিলম্বিত হলে, সমাজে পূর্ণাঙ্গ নর বা নারী হওয়ার বাসনাটা তাকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তোলে।

আচরণ: কৈশোরের প্রথম দিকটা ছেলে-মেয়েদের জন্য খুবই অসহিষ্ণু সময়। এ সময় কারও কর্তৃত্ব ও নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব সৃষ্টি হয়। এ সময় ছেলেরা মেয়েদের এবং মেয়েরাও ছেলেদের প্রতি আড়চোখে তাকানো, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, প্রেম নিবেদন করা ইত্যাদি অসামাজিক আচরণ করে থাকে, তবে তা সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি সাপেক্ষ।

সমাধান

অভিভাবক ও শিক্ষকের করণীয়: এ সময় মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমাজকে তাদের প্রতি সহজ ও সহনশীল হওয়া খুবই প্রয়োজন। কিশোর বয়সীরা এসব সমস্যার সঠিক ও বাস্তব সমাধান যদি মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং চিকিৎসক বা পরামর্শকের কাছ থেকে না পায়, তবে তারা ভুল তথ্য,কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং বিকৃত চিন্তা-ভাবনার শিকার হয়। অনেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে। এমনকি বদনেশাগ্রস্ত এবং মানসিক রোগগ্রস্তও হয়ে যেতে পারে। যার প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন কিশোর অপরাধের মাধ্যমে, যা প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই।

তাই, বয়ঃসন্ধিকালে মা-বাবা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব এই উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে বা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া। তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া, দেহে যে পরিবর্তন হচ্ছে বা হবে সে সম্পর্কে তাদের জানান দেয়া। তাদের সঙ্গে সহজ-সাবলীল, বন্ধুভাবাপন্ন ও সহনশীল আচরণ করা। তাদের চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং আন্তরিক ও যত্নবান হওয়া।

ঘরে মা-বাবাকে এবং স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বয়ঃসন্ধির পরিবর্তনটা খেলো ব্যাপার নয়। কিশোর-কিশোরীদের এসব পরিবর্তন নিয়ে তাই কখনো হাসি-তামাশা করা, বিদ্রুপ করা, খোঁচা বা খোঁটা দেয়া, অন্যের সঙ্গে তুলনা করা, তাচ্ছিল্যভাব দেখানো ইত্যাদি চলবে না।

এ সময় বাড়ন্ত শরীরের কারণে তার পোষাক ঘন ঘন বদলাবার প্রয়োজন হতে পারে, তাকে স্বাগত জানাতে হবে। ছেলে বা মেয়ে ঘরের বা স্কুলের বাইরেও যদি কারো দ্বারা এ ধরনের ঠাট্টা-বিদ্রুপের শিকার হয়, তবে তাকে দোষী সাব্যস্ত বা ভর্ৎসনা না করে সে অনাহুত পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে হবে বা সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

এ সময় ছেলে-মেয়েদের সমবয়সী বন্ধু, শিক্ষক বা বয়স্ক স্বজনদের দ্বারাও যৌন-পীড়ন বা সন্ত্রাস এবং নিষ্ঠুর সামাজিক আচরণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই বেশি। ছেলে-মেয়েরা ধর্ষণ, সমকামিতা, হস্তমৈথুন ইত্যাদি বিকৃতির শিকার হতে পারে। আত্ম-সচেতনতার সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক হচ্ছে, সামাজিক নিষ্ঠুর আচরণের কারণে আত্মদহনে ভোগা। অর্থাৎ আমার চেহারা এমন হলো কেন যে, অমুক আমার প্রতি এ রকম খারাপ ব্যবহার করলো! আমার এটা কি একটা অসুখ? যৌন হয়রানি বা নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে কিশোরীরা নিজেকে সমাজে অবাঞ্ছিত মনে করে। এর পরিণামে অনেকেই ধূমপান, গাঁজা সেবন, বদনেশাসক্ত হয়ে পড়তে পারে এবং কেউ কেউ (যৌন হয়রানির শিকার হয়ে) আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। যা আমরা অহরহ সংবাদ মাধ্যমে দেখতে পাই।

এসময় মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুক্তভোগীকে সমবেদনা ও সান্ত্বনা দেয়া এবং এটা বোঝানো যে, এ জন্য ব্যক্তিগতভাবে সে মোটেই দায়ী নয়। সে যেন কিছুতেই নিজেকে দোষী বা অপবিত্র মনে না করে। এ জন্য যে ব্যক্তি কু-কর্মটি করেছে তাকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিৎ।

মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমাজের পক্ষে কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের সন্তান/শিক্ষার্থীকে সামলানো বা তার সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হলে, দেরি না করে অবশ্যই মনোবিজ্ঞানী বা মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

সমাজের করণীয়: তাদের মুক্ত পরিবেশে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়া। খেলাধুলা, সাহিত্যকর্ম, বিতর্ক, আবৃত্তি, অভিনয়, নাচ, গান-বাদ্য, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য তৈরি প্রভৃতি শিল্পকর্মে (performing arts) অংশগ্রহণ এবং নৈপুণ্য অর্জনে উৎসাহ দেয়া এবং সাহায্য করা। এ জন্য পরিবারে, বিদ্যালয়ে এবং কমিউনিটিতে সাধ্যমতো খেলা, সৃজনশীল কর্ম, সুস্থ বিনোদন এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সূত্র:

Erikson EH. Childhood and Society. New York: Norton; 1950.

Gungor N, Arslanian SA (2002). "Chapter 21: Nutritional disorders: integration of energy metabolism and its disorders in childhood".

Marshall WA, Tanner JM (1986). "Chapter 8: Puberty". In Falkner F, Tanner JM (eds.). Human Growth: A Comprehensive Treatise (2nd ed.). New York: Plenum Press. pp. 171–209. ISBN 978-0-306-41952-2.

Rosenfield RL (2002). "Chapter 16: Female puberty and its disorders". In Sperling, MA (ed.). Pediatric Endocrinology (2nd ed.). Philadelphia: Saunders. pp. 455–518. ISBN 978-0-7216-9539-6.

Styne DM (2002). "Chapter 18: The testes: disorders of sexual differentiation and puberty in the male". In Sperling, MA (ed.). Pediatric Endocrinology (2nd ed.). Philadelphia: Saunders. pp. 565–628. ISBN 978-0-7216-9539-6. এবং

লেখক: সমালোচক ও অনুবাদক। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "লাক্কির রাজনীতির ব্যাকরণ ও বাংলাদেশের রাজনীতি" (সৌম্য প্রকাশণী)

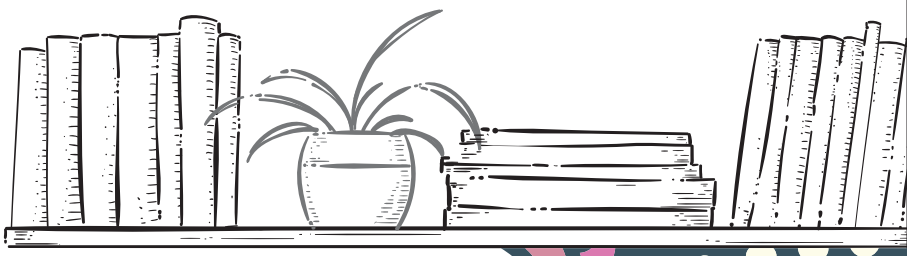

বদল

শিশির মল্লিক

যে রূপ দেখেছি তোমার
এখন দেখি অন্য রূপ
ঘা খাওয়া মনে উঁকি দেয় পুরোনো চাঁদ
সূর্যালোকে ঝলসে ওঠা চোখ
জোৎস্নার নরম মায়ায় নাচে

মনের ভাঁজে জমে থাকা রাশি রাশি শষ্যের ঘ্রাণ
গোত্তা খায় মেকি আলোর বিভ্রমে
নিরুদ্বেগ আমি হাঁটি একাকী
আত্মস্বার্থপরতা টুকরো টুকরো করে গিলে
কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু বলে না কেউ

যেটুকু আলো এসে লাগে তবু প্রাণে
দেখি রাজদণ্ড কাঁপে থরোথর
পাল্টায় পুরোনো নিয়ম; রীতি-নীতি
রাষ্ট্রের আদল।

৩ নাকের নোলক

হুমায়ুন কবির

গাঁয়ের মেয়ের নাকে নোলক
রুপার পায়েল পায়,
মাটির কলসি কাঁখে নিয়ে
নদীর তীরে যায়।
সঙ্গে থাকে প্রাণের সখী
রসের কথার রথ,
চুলাচুলি কথার কথা
করে সারা পথ।
গাঁয়ের ছেলে জোয়ান কৃষাণ
কাজে করে ভুল,
রূপের কন্যার কালো চুলে
থাকে যদি ফুল।
চিরল দাঁতে হেসে কন্যা
মিষ্টি কথা কয়,
কৃষাণ ছেলের হৃদয় জুড়ে
বৈশাখি ঝড় বয়।
হাঁটু ভেজা কাপড় নিয়ে
ফিরে মেয়ে ঘর,
কৃষাণ ছেলের মনের মাঝে
উঠে প্রেমের ঝড়।

বেয়াড়া সাধ

মাহ্‌ফুজ সালাম

চোখের কাজলে মৌনতার আঁকা আঁকি
নুয়ে পড়ে ফোটা ফোট রং
নাটাইয়ের সুতো ছিঁড়ে উড়ে যায় রঙিন ঘুড়ি
বাতাসের বৈরিতায়।

শিকড় উঠে ছিল শিখরে অনন্য উচ্চতায়
কালোর সাথে ভালোর মিশেলে বাঁধে মৈত্রি
কষ্টের সাথে নষ্টরা মিলে
বাজায় বিষের বাঁশি ।

বদলে যাওয়া সময়ে
ঘুঙ্গুর পড়ে আসে রোদেলা দুপুর, বিষন্ন বিকেল
মুহূর্তগুলো রং বদলায় রাত্রির মগ্নতায়
প্রাচুর্যের পলেস্তারা খসে পড়ে জনপদে ।

তবুও কদম ফুটে
ফুটে বেলি, শেফালি, হাসনাহেনা
বৃষ্টিজলে স্নাত আজ বিবাগি মন
থৈ থৈ আঙিনা জুড়ে মুক্ত মাছেদের উৎসব
আকাশে জেগে ওঠে রংধনুর সাত রং।

প্রভাত পাখিদের কলকাকলি
সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘুমায় স্বজন
স্বপ্নভোর রক্তের আলপনা আঁকে
পুঞ্জিভূত বেদনার বিকেল
কেড়ে নেয় শুভ্রতার দিনক্ষণ।

এখন কেবলই একাতিত্বে বসবাস
বাতাবি লেবুর কঁচি পাতা আগের মতই স্নিগ্ধতা ছড়ায়
বিতর্কিত মুহূর্তগুলো আঁকড়ে ধরে আয়ুষ্কাল
বেঁচে থাকার বেয়ারা সাধ তবু অফুরান...

মেধাবীদের নিয়ে ঢাকঢোল, ব্যর্থতার বেলায় পিছটান!

অলোক আচার্য

মেডিক্যাল, বুয়েট বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি পরীক্ষার পর আমাদের দেশে দেখা যায়, যে ছেলে বা মেয়েটি প্রথম বা ভালো অবস্থানে আছে, বিশেষত প্রথমজনকে নিয়ে এক ধরনের টানাহেঁচড়া শুরু করে কোচিং সেন্টারগুলো। প্রত্যেকেই দাবী করে সে তাদের কোচিং সেন্টারে প্রস্তুতি নিয়েছে! কখনও তার ব্যতিক্রম হয় না। সত্যি কথা বলতে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ভর্তি পরীক্ষায় ভালো অবস্থান তৈরি করার পেছনে সেই ছাত্রছাত্রীর মেধা নয় বরং সেই কোচিং সেন্টারের ভূমিকাই প্রধান। এ বিষয়টা কি একটু আশ্চর্যজনক না! উন্নত কোনো দেশে এই চিত্র আছে মানে এই টানাটানি আছে বলে আমার জানা নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে কম আলোচনা হয় না। এই যে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর ছবি নিজেদের কোচিং সেন্টারের বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপনের সাথে টাঙিয়ে ভর্তি করার প্রবণতা এটা অতিমাত্রায় বাণিজ্য! এটুকু না করলে কি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে না? এই নির্লজ্জ কাজটুকু করার মাধ্যমে তারা নিজেদের অবস্থানকেই হাস্যকর এবং প্রশ্নবিদ্ধ করছেন।

কারিকুলামের আমূল পরিবর্তন চলছে। পরিবর্তিত কারিকুলাম অনুযায়ীই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় ও হবে। এই কারিকুলামের একটি উদ্দেশ্য কোচিং বা প্রাইভেট নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা। কিন্তু এখনও তা সম্ভব হচ্ছে না, আদৌ হবে কি না কে জানে! আর হলেও বা কতটা? উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করেই ছাত্রছাত্রী ছুটতে থাকে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের দোরগোড়ায়। সেই ছোটাছুটি দেখলে যে কেউ মনে করবে কোচিং সেন্টারে ভর্তি না হলে ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া যাবে না অথবা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে না। এই বিশ্বাসটাই এতদিনে এক ধরনের আত্মবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে! এবং যারা মোটা টাকা খরচ করে কোচিংয়ে ভর্তি হতে পারছে না তারা যদি কাঙ্ক্ষিত জায়গায় ভর্তি হতে না পারে তাহলে অবলীলায় দোষ দেয় কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে না পারার! অর্থাৎ কোচিং সেন্টারই মেধা বিকাশের প্রধান কেন্দ্র! শিক্ষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে কোচিং সেন্টার হয়তো কিছু ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু যখন প্রশ্ন ফাঁসের সাথে কোচিং সেন্টার এবং শিক্ষকদের নাম আসতে থাকে তখনই এই বিষয়ে সবচেয়ে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। এটা তো সত্যি যে কোচিং এখন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

লক্ষ্য ছিল একটু অতিরিক্ত পড়ানো বা শেখানো বা চর্চা করানো। সেখান থেকে কার কয়টা ছাত্রছাত্রী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে সেই প্রতিযোগিতায় কোচিং সেন্টারগুলো ব্যস্ত! আর অভিভাবকদেরও এই ধারণা মজ্জাগত হয়েছে যে কোচিং করলেই তার সন্তানের যাবতীয় মেধার বিকাশ ঘটা সম্ভব! এডুকেশন ওয়াচের গবেষণায় বলা হয়েছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৯ শতাংশ ও সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয়ের ৭১ শতাংশ নির্বাহ করে পরিবার। এই অর্থের সবচেয়ে বড় অংশ ব্যয় হয় কোচিংয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৩ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী কোচিংয়ে আটকা পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) অধীন উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প গবেষণা করে দেখেছে, ভর্তি-ইচ্ছুক প্রতিজন শিক্ষার্থীর পেছনে বছরে (এক সিজন) ভর্তি কোচিং ও আনুষঙ্গিক বাবদ খরচ হচ্ছে প্রায় ৪৩ হাজার টাকা। প্রকাশিত ওই গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী কোচিং করেন।

সবকিছু যদি আধুনিক ধারায় পরিবর্তন করতে পারি তাহলে শিক্ষাপদ্ধতির কেন পরিবর্তন হতে পারে না? কেন পাবলিক পরীক্ষায় ফেল করে কয়েকজন আত্মহত্যা করবে? কেন শিক্ষা জীবন শেষ করার পরেও বেকারত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে পায়ের তলা ক্ষয় করবে? নিজে কিছু করতে পারবে না কেন? আর উচ্চশিক্ষা স্তরে বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কোচিং সেন্টারগুলোর এই ধরনের টানাহেঁচড়া আদৌ বন্ধ হবে কি? না হওয়ার কারণ, অভিভাবকরা হন্যে হয়ে তার আদরের সন্তানকে দিনরাত পড়ালেখায় ব্যস্ত রাখছে। সন্তানকে ভালো ফল করতেই হবে। ফলে শিক্ষার্থীকে দিনরাত প্রাইভেট পড়তে হয় এবং কোচিংয়ে ভর্তি হতে হয়। ভাল কোথাও ভর্তি হতে পারলেই শিক্ষার্থীকে নিয়ে রশি টানাটানি শুরু হয়। তখন সে প্রায় প্রতিটি কোচিং সেন্টারেই পড়ালেখা করেছে এমন চিত্র পাওয়া যায়।

কিন্তু যারা চান্স পেলো না তাদের কথা কি কেউ বলে? মানে কতজন অকৃতকার্য হচ্ছে বা টাকা খরচ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল পেলো না সে হিসাব তো কেউ দিচ্ছে না। অর্থাৎ সাফল্যের ভাগীদার হচ্ছে সকলেই কিন্তু ব্যর্থতার দায় কেউ নিচ্ছে না। সাফল্য হলে তা কোচিং সেন্টারের আর ব্যর্থ হলে তা ছাত্রছাত্রীর নিজের দায়! এ অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজমের অনন্য স্থান টাঙ্গুয়ার হাওর

ইমরানুল আলম

কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজমের অনন্য স্থান বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত হিসেব মেলাতে গেলে টাঙ্গুয়ার হাওরই বিরাজমান। কিভাবে? সেটা বলছি! হাওরে নৌকার তলা বানানোর মিস্ত্রি, যোগালি থেকে শুরু করে নৌকা পরিচালনার জন্য মাঝি, ড্রাইভার, লস্কর, বাবুর্চি, সার্ভিসম্যান বেশিরভাগই হাওর অঞ্চলের হয়ে থাকে। এছাড়া বাজার-সদাইও এই অঞ্চল থেকেই করা হয়। এই হাওরের মাছ কিংবা হাওরের জলে সাঁতার কেটে বেড়ে উঠা হাঁস ট্যুরিস্টদের প্রধান আকর্ষণ।

সিজন শেষে সেই নৌকা/হাউজবোট এর দেখভালের ভারও হাওরাঞ্চলের লোকজনের কাছেই নির্বিঘ্নে সপে আসি আমরা। অর্থাৎ একটা অঞ্চলের ট্যুরিজম এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলা চলে এই অঞ্চলের মানুষের দ্বারাই পরিচালিত হয়। কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজম এর চিন্তার খোরাক বাংলাদেশে অনেকটাই মেটাচ্ছে টাঙ্গুয়ার হাওর।

হাওরে ঘুরতে গেলে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যেহেতু আপনি ভ্রমণকালে তাদের আশেপাশে থেকেই ঘুরবেন। কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজমে মানুষ মূলত চায় যেখানে যাবে সেই অঞ্চলের জীবনযাত্রায় নিজেই ঢুকে যাবে, সেটা এখানে পাওয়া যায়। একটা অঞ্চল শুধু ট্যুরিজমের উপর ভিত্তি করে চোখের সামনে তরতর করে পরিবর্তন হয়েছে, লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান এবং চুলায় আগুন জ্বালানোর অন্যতম উপায় হয়েছে, সেটা ভাবতেই শিহরণ জাগে। একটা অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিপ্লবের সরাসরি সাক্ষী পর্যটন! এর গভীর পর্যালোচনা না হয় অন্য কোন দিন করবো। এই পরিবর্তন আর হাওরাঞ্চলের জীবনযাত্রা নিজ চোখে দেখে উপলব্ধি করতে হলেও হাওরে ঘুরতে যাওয়া উচিৎ। কারণ হাওর খুবই Mysterious! কেননা আপনি হাওরে শীতকালে গেলে দেখবেন একরকম দৃশ্য। চারপাশে ধু ধু প্রান্তর, মাইলের পর মাইল খোলা জায়গা কিংবা ধানের ক্ষেত, দূরে মেঘালয়ের পাহাড়। অথচ বর্ষায় একই জায়গায় থাকবে মাইলের পর মাইল স্বচ্ছ টলটলে জল, সেই জলের উপর দিয়ে শতশত ছোট-বড় নৌকা/হাউজবোট ভেসে বেড়াবে যেখানে ক'দিন আগেও মানুষ হেঁটে চলাচল করতো কিংবা ছুটে চলতো মোটরসাইকেল নিয়ে। কি অদ্ভুত না? আরো অদ্ভুত লাগবে যখন দেখবেন হিজল কিংবা করচ গাছের সামান্য কিছু অংশ পানির উপর ভেসে আছে ২০০২ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের রোনালদোর চুলের স্টাইলের মতন। এই টলমল করা পানি দেখে পানিতে সাঁতার কাটার লোভ থেকে নিজেকে আটকানোই দায় হয়ে যাবে। এর মাঝে যদি ঝুম বৃষ্টি নামে, আপনি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ভাবতেই পারবেন। কারণ এতো স্নিগ্ধ নির্মল বৃষ্টি আপনার হৃদয়কে পর্যন্ত শীতল করে তুলবে।

প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত, তার মাঝে অদ্ভুতুরে হচ্ছে হাওর। কোথা থেকে দুই-তিন কিংবা চার মানুষ সমান পানি আসে, আবার ধীরলয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়, সেই হিসেব কষতে কষতে হাওর বদলে ফেলে তার রূপ! আবারও অনেক দিনের অপেক্ষায় ভাসিয়ে বিদায় নেয় টলটলে জলাধার। হাওরে যখন নৌকা ভাসে, ছাদে বসে চারপাশে দ্বীপের মতন সহস্রাধিক বাড়ি দেখা যাবে যার চারপাশেই রয়েছে শুধুই পানি। জনপদের সাথে তাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌকা।

হাওরের প্রায় পুরোটা ট্রিপই হয় পাহাড়বেষ্টিত মেঘালয়ের কোল ঘেঁষে। মাঝেমধ্যে একটু খারাপ লাগা ভর করে এটা ভেবে যে "ইশ, এই পাহাড়গুলো বাংলাদেশের হলো না কেন!" পরক্ষণেই আবার ভ্রমণপিপাসু মন এও বলে দেয়- "প্রকৃতির কোন সীমানা নেই, সুন্দর যে দেশেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক, সে সুন্দরই!"

বাঁধভাঙা সৌন্দর্যে নিজেকে সাময়িক বিলীন করতে আর নিজ দেশের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি উপভোগ করতে হাওর ভ্রমণ করতে পারেন। কথা দিচ্ছি, একরাশ নিস্তব্ধতা উপভোগ শেষে ফিরবেন একরাশ গল্পগুচ্ছ নিয়ে; ভুলতে না পারা অনেকগুলো সুখস্মৃতি নিয়ে।

লেখক: ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ফাউন্ডার, ট্যুর গ্রুপ বিডি (টিজিবি)

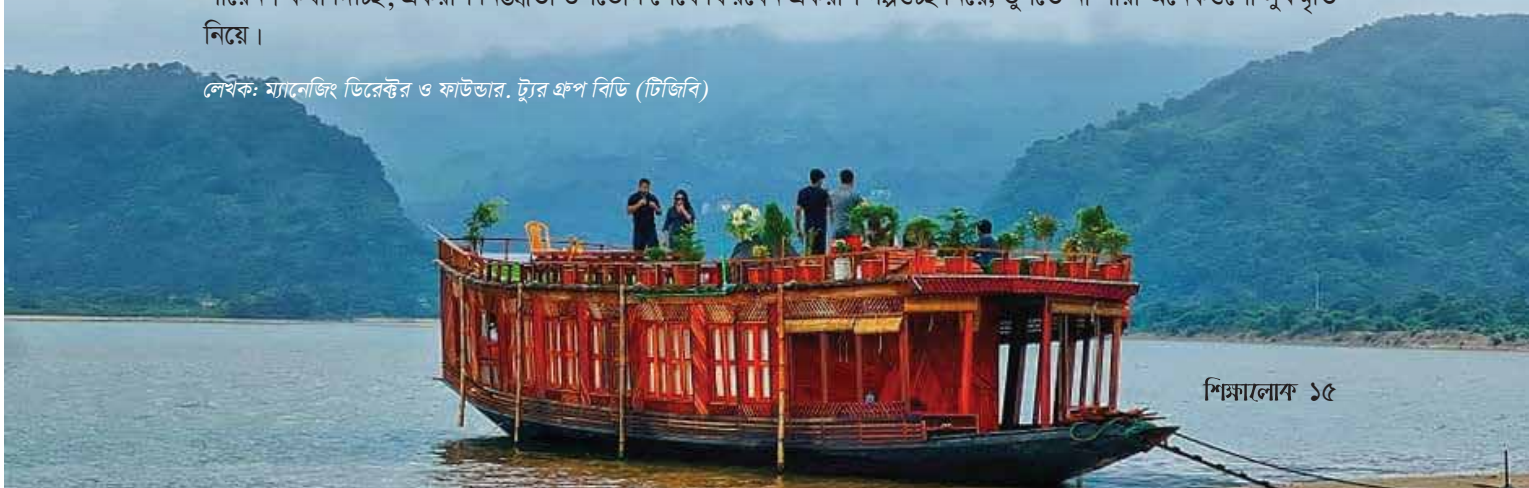

সহযোগিতা ও সহনশীলতার জাপানি সূত্র গানবাত্তে কুদাসাই

এস এম মুকুল

জাপানিরা ভূখণ্ড বা প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও শুধু পরিশ্রম, মেধা ও কর্মনিপুণতার শক্তিতে উন্নতির শিখরে ঠাঁই করে নিয়েছে। অনেকের ধারণা এর পেছনে তাদের অন্যতম মন্ত্র হয়তোবা 'গানবাত্তে কুদাসাই' বা 'হাল ছেড়োনা'। জাপানিরা বিনয়ী জাতি হিসেবে সুপরিচিত। পৃথিবীতে সহনশীল, সহিষ্ণু জাতি হিসেবে জাপানিদের সুনাম রয়েছে। জাপানিদের সহনশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একজন পর্যবেক্ষক তাঁদের সংস্কৃতির একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় তুলে ধরেন, আর তা হলো- জাপানিরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায়ের সময় বলে থাকে 'গানবাত্তে কুদাসাই', যার কাছাকাছি অর্থ 'হাল ছেড়ো না'। পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণাটিও জাপানিদের মধ্যে প্রবল। এ প্রসঙ্গে টোকিওর টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেফ কিংসটন বলেন, বড় বিপর্যয়ে জাপানিদের ভেতরটা কান্নায় মোচড়ালেও তারা মুখে হাসি ধরে রাখে। এমনও শোনা গেছে, কোনো স্বজন মারা যাওয়ার পরও অনেকে জোরে কান্নাকাটি করে না পাশের বাড়ির লোকজনের অসুবিধা হতে পারে ভেবে। বলা হয়ে থাকে- জাপানিদের মধ্যে দুর্যোগ ও বিপদ-আপদে আতঙ্কিত হওয়ার প্রবণতা খুব কম। এর কারণ ব্যাখ্যা করে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সেন্দাই শহরের পৌর কর্মকর্তা মাচিকো কুনো বলছিলেন, তাঁরা ভাবেন, কেউ আতঙ্কিত হলে দেখাদেখি অন্যরাও ভয় পেয়ে যাবে। এতে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। তাই শত বিপদেও তাঁরা স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেন। ধারণা করা হয়, সম্ভবত একারণেই দুটি বিশ্বযুদ্ধ সামাল দিয়ে দ্বীপ দেশ জাপান অনেক দিন ধরেই বিশ্বের কয়েকটি শীর্ষ ধনী দেশের মধ্য অবস্থান করছে।

১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দেওয়া কয়েকটি দেশের মধ্যে জাপান অন্যতম। জাপানের ইতিহাস থেকে জানা যায়। জাপানিরা জন্মগতভাবেই পরিশ্রমী। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। ফলে ছুটির দিনে ঘুরে বেড়িয়ে মানসিক ক্লান্তি দূর করে জাপানিরা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে জাপানকে রেলের দেশ বললেও ভুল বলা হবেনা।

জাপানজুড়ে রেলওয়ে মাকড়শার জালের মতো ছড়িয়ে আছে। ফলে অভ্যন্তরীণ পর্যটনে এক বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছে অর্থনৈতিকভাবে। এই দেশে যে কত স্থান আছে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তার হিসেব নেই। রেলগুলো যেমন আরামদায়ক তেমনি নিয়ম মেনে চলাই তাদের নীতি। এক মিনিট কোনো কারণে বিলম্ব হলে কতবার যে ক্ষমা চেয়ে ঘোষণা দেন চালক, বিশ্বাস করাই মুশকিল।

আপনি কি জানেন- কারাতে মূলত জাপানি শব্দ। কারাতে মূলত এক ধরনের মার্শাল আর্ট যা খালি হাতে প্রয়োগ ঘটানো হয়। কারাতে দক্ষ হতে হলে একজন ব্যক্তিকে সারাবছর সর্বদাই কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার মাঝে থাকতে হয়। জাপানের প্রত্যন্ত দীপাঞ্চল থেকে কারাতের জন্ম। আদিকাল থেকেই জাপানিরা পরিশ্রমী, তাদের সর্বদাই প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করেই বাঁচতে হয়েছে। আর সে কারণেই মূলত আত্মরক্ষার তাগিদ থেকেই মার্শাল আর্টের জনপ্রিয়তা পায় জাপানিদের মধ্যে। আর মার্শাল আর্টের একটা সংস্করণ কারাতে খেলা হিসেবে কারাতে প্রতিষ্ঠিত করা আর টিকিয়ে রাখা জাপানিদের অবদান।

আমরা জানি, পৃথিবীর দ্রুত শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে জাপান পরিচিত। জাপানের সাথে বাংলাদেশের তুলনা করলে দেখা যাবে গত সত্তর বছর আগে জাপানও অতি দরিদ্র অর্থনৈতিক অবস্থানে ছিল। তখন জাপানে রাস্তাঘাটে ভিখারী ছিল। মানুষ গাছের নীচে বসে চুল, দাড়ি কাটাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপান দারিদ্র্যসীমার নিচে স্থান পায়। সেই দারিদ্র্য অবস্থা থেকে প্রত্যয়ী জাপানিরা পৃথিবীর অতি উন্নত অর্থনৈতিক সীমারেখায় পৌঁছেছে।

জাপানিরা পৃথিবীর অনেক মানুষের কাছ থেকে 'অতি পরিশ্রমী' হিসেবে বিদ্রুপও শুনেছে। কিন্তু দরিদ্র অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে পরিশ্রম করে গেছে। তার পেছনের মন্ত্র হয়তোবা 'গানবাত্তে কুদাসাই' বা 'হাল ছেড়োনা'। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাপানের ১০০ মিলিয়ন মানুষ ভয়ংঙ্কর দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। একদিকে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা অপরদিকে ধ্বংসস্তূপের অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং আধুনিকীকরণ ছিলো জাপানীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে কে বলতে পারতো মাত্র চার দশকে বিধ্বস্ত জাতিটি একটি আধুনিক সমৃদ্ধ জাপান গড়ে তুলবে!

চার দশক পর জাপানের উত্থান নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মূল্যায়ন হলো- 'প্রতিকূলতাই জাপানিদের জন্য আশীর্বাদ। বিশ্লেষকদের মতে-

১. একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকায় বিপুল জনগণের বসবাস ছিলো জাপানিদের জন্য প্রথম আশীর্বাদ। বাঁচার তাগিদে প্রচণ্ড রকমের কর্মপ্রেরণা এবং প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো তাদের মধ্যে।

২. কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকাটা ছিলো জাপানীদের জন্য দ্বিতীয় আশীর্বাদ। ফলে জাপানিরা সারা পৃথিবীর অঢেল সম্পদ আহরণে সচেষ্ট হয়েছিলো।

৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সব শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা ছিলো জাপানিদের জন্য তৃতীয় আশীর্বাদ। পরে নতুন এবং অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে তারা প্রতিটি শিল্প কারখানা গড়ে তুলল।

এবার আসুন বাংলাদেশের কথায়। বাঙালিরাও হাল না ছাড়ার জাতি। জাপানিরা যেমন পরিশ্রমী, বাঙালিরাও তেমনি প্রত্যয়ী জাতি। বাঙালিরা যা ভাবে তা করেই ছাড়ে। এ কারণে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও বাঙালি জাতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার কথা ভাবছে উন্নত দেশগুলো। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে জাপানি আকিরা জুকো বলছিলেন, 'পৃথিবীর দ্রুত শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত জাপান। জাপানের সাথে বাংলাদেশের তুলনা করলে দেখা যাবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে আছে। কিন্তু অতীত ইতিহাসের দিকে পেছন ফিরে তাকালে গত পঞ্চাশ বছর আগে জাপানও অতি দরিদ্র অর্থনৈতিক অবস্থানে ছিল। পক্ষান্তরে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাঙালি মানুষ বড়ই কাজের। কাজের সুযোগ পেলেই হলো। উপার্জনের পথ পেলেই হলো। নির্দ্বিধায় কাজ করে আমাদের দেশের মানুষ। প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যে যার ভূমিকায় কাজ করতে পটুয়া বাঙালিরাও।

কৃষকের কথাই ধরা যাক। কী বন্যা, কী খরা কতভাবেই কত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে স্বপ্নমিশ্রিত ঘাম ঝরানো সোনার ফসল। তবু থামেননি কৃষক। কোনো বিপর্যয়ই তাদের দমাতে পারেনি। বন্যার পর দেখা যায় বন্যার জল সরতে না সরতেই নতুন ফসল বোনার জন্য আবারও মাঠে নামে কৃষক। ফসল রক্ষায় তারা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে মসজিদে, মন্দিরে, গির্জায়। নিঃস্ব, শূন্য অবস্থান থেকেও বার বার ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলার কৃষক। ফলিয়েছে সোনার ফসল।

এদেশের মানুষ অলস অকর্মণ্য নয়। এসব আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পই তার প্রমাণ বহন করে। শুধু এখনই নয়, যুগ যুগ ধরেই এদেশের মানুষ হাতের কাজ, কুটির শিল্প এমনি নানা কাজকর্মে নিয়োজিত থেকেছে। এধারা এখনও প্রবাহিত হচ্ছে। বংশ পরম্পরায় আমাদের ঐতিহ্য বহনকারী কিছু পেশাকে উপজীব্য করে ধরে রেখেছেন দেশের মানুষ। এসব পেশা দেশীয় ঐতিহ্যের সুনাম অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্বাবলম্বনের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল একসময়। উদ্যোগ, ব্যবস্থাপনা, সহযোগিতা আর সুনজরের অভাবে এসব শিল্প সম্ভাবনার পথকে ক্ষীণ করে রেখেছে। চাইলেই এই পরম্পরায় দক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা অসম্ভব কিছু নয়।

আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা বাড়ছে। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক তৎপরতাও সৃষ্টি হচ্ছে। সবাই ভালো থাকতে চায়। স্বচ্ছল থাকতে চায়। ভাল থাকার স্বপ্ন দেখে। এটি আশার কথা। এজন্য প্রয়োজন কাজের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করা।

> "
>
> জাপানিরা বিনয়ী জাতি হিসেবে সুপরিচিত। পৃথিবীতে সহনশীল, সহিষ্ণু জাতি হিসেবে জাপানিদের সুনাম রয়েছে। জাপানিদের সহনশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একজন পর্যবেক্ষক তাঁদের সংস্কৃতির একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় তুলে ধরেন, আর তা হলো- জাপানিরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায়ের সময় বলে থাকে 'গানবাত্তে কুদাসাই', যার কাছাকাছি অর্থ 'হাল ছেড়ো না'

সমাজের নিম্নস্তরে যারা আছে যাদের স্বচ্ছলতাহীন অর্থনৈতিক জীবন, তাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এদেশের সাধারণ মানুষের চাহিদা সামান্য। অল্পে তুষ্ট মানুষেরা খেয়ে পড়ে নিরাপদে বেঁচে থাকতে চায়। এদেশের মানুষ মাঠে-ঘাটে কাজ করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে। এসব উদ্যোগী ও পরিশ্রমী লোকদের সংগঠিত করা গেলে এবং তাদের সহযোগিতা করা হলে সার্বিকভাবে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। খুলে যাবে সম্ভাবনার দুয়ার।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ

৮জুন ২০২৪ সিদীপ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে কুটি এরিয়ার হায়দ্রাবাদ ব্রাঞ্চের অন্তর্গত হাজী ইয়াকুব আলী উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সেরা পাঠক পাঠিকাদের জন্য পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আনোয়ারুল হক, সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. মাঈনউদ্দিন, আরো উপস্থিত ছিলেন এরিয়া ম্যনেজার (কুটি) মো. শামসুল আলম, ব্রাঞ্চ ম্যনেজার মো. আলাউদ্দিন, শিক্ষা সুপারভাইজার মাহমুদা আক্তার ও শাখার অন্যান্য কর্মীবৃন্দসহ আরো অনেকে। এছাড়াও সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহ্সান উপস্থিত ছিলেন ।

১০ জুন ২০২৪ সিদীপের সাঁথিয়া শাখার আওতায় গৌরীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক পাঠিকার পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সরিয়ত উল্লাহ, সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. সেলিম, লাইব্রেরিয়ান মোছা. মাহমুদা খাতুন উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং শিক্ষার্থীদের বই পড়তে উৎসাহিত করে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও সাঁথিয়া শাখার ম্যানেজার মো. আব্দুস সালাম, শিক্ষা সুপারভাইজার মোছা. রুখসানা আক্তার, সেকমো দেবাশিস কুমার রায় এবং প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

১০ জুন ২০২৪ সিদীপ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম এরিয়ার বনপাড় ব্রাঞ্চের আওতায় সেন্ট জোসেফস স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয় সেরা পাঠক পাঠিকাদের জন্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ইনচার্জ মাধ্যমিক শাখার ফাদার পিউস গোমেজ, শিক্ষিকা সুফলা

ক্রুজ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. আবু হোসাইন, শিক্ষা সুপারভাইজার সুমি খাতুন ও শাখার অন্যান্য কর্মীবৃন্দসহ আরো অনেকে। সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গাজী জাহিদ আহ্সান।

১১ জুন ২০২৪ সিদীপের গোপালপুর(লালপুর) শাখার আওতায় সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফ্লোরা পারভীন, পার্শ্ববর্তী সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও গোপালপুর শাখার ম্যানেজার মো. আল মাহমুদ, শিক্ষা সুপারভাইজার লোপা রানী সরকার, সেকমো মো. গোলাম রাব্বানি ও প্রধান কার্যালয় থেকে মো. মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

১১ জুন ২০২৪ সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ এরিয়ার শিবগঞ্জ ব্রাঞ্চের অন্তর্গত দাদনচক হেমায়েত মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সেরা পাঠক পাঠিকাদের জন্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. গোলাম রাব্বানী, সিনিয়র শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান, ব্রাঞ্চ হিসাবরক্ষক মো. মনিরুল ইসলাম, শিক্ষা সুপারভাইজার মোসা. কিসমোতারা ও বিদ্যালয়ের আরো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গাজী জাহিদ আহ্সান।

১লা জুলাই ২০২৪ সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে হাজীগঞ্জ ব্রাঞ্চের আওতায় হাজীগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয় সেরা পাঠক পাঠিকাদের জন্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মো. আবু সাঈদ, সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. হোসাইমুল আযম, শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলম, আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বিল্লাল হোসাইন, শিক্ষা সুপারভাইজার ইতি ও শাখার অন্যান্য কর্মীবৃন্দসহ আরও অনেকে। সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহ্সান।

১৬ জুলাই ২০২৪ গাজীপুরে কাশিমপুর হাইস্কুল এন্ড কলেজে সিদীপ পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের সেরা পাঠক-পাঠিকাদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন ও পুরস্কার দেন সম্মানিত অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান, সহকারী প্রধান শিক্ষক মো.

মোয়াজ্জেম হোসেন, গ্রন্থাগারিক ফারহানা রাজিয়া, সিদীপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল কর্মকর্তা এনামুল হক, শিক্ষাসুপারভাইজার নীলুফা ইয়াসমিন ও অন্যান্য। প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন জনাব আলমগীর খান। সিদীপের পক্ষ থেকে মুক্তপাঠাগারে আরো নতুন বই উপহার দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন করে।

১৬ জুলাই ২০২৪ সিদীপের মীরসরাই শাখার আওতায় আবু তোরাব উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মর্জিনা বেগমসহ সহকারী শিক্ষক জনাব এম জে মামুন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিদীপের শাখা ব্যবস্থাপক মো. রফিকুল ইসলাম, শিক্ষা সুপারভাইজার রোকেয়া বেগম ও শিসকের কয়েকজন শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা নিয়ে গবেষণাপত্র উপস্থাপন

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫-২৬ নভেম্বর ২০২৩এ Unfolding Emerging Issues in the Context of Changing Climatic Scenario শীর্ষক একটি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনটিতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞানী এবং কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সময়োপযোগী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এর মধ্যে কৃষি, জলসম্পদ, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, লিঙ্গ বৈষম্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সাসটেইনেবল সিটি, অভিবাসন এবং মাইগ্রেশন, ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশগত শিক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র অফিসার এবং সিদীপের CFLI এবং PLEASE প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী মাহবুবুর রশীদ অরিস সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং Coastal Resilience সেশনে Gender-based Vulnerabilities at the Cyclone Shelters in Coastal Belt of Bangladesh: a study in Hatiya Upazila বিষয়ে তার গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

ঝম ঝম বৃষ্টি

মীর আনিশা তাহসিন, ১০ম শ্রেণি

ঝম ঝম বৃষ্টি
দেখতে এতো সুন্দর
কেড়ে নেয় দৃষ্টি
হয় খুব আনন্দ!

গৃহে বসে থাকা
কোনো কাজ নাই
খালি ঝম ঝম বৃষ্টি দেখা
আর হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে যায়

ঝম ঝম বৃষ্টি
মন ভরে যায়
গন্ধ খুব মিষ্টি
কোনো দুঃখ নাই

বসন্তের আবহাওয়া

প্রজাপতিদের অপরূপ ফুলের বাসা
পাখির সুরেলা কলতান
মিষ্টি গোলাপের সুগন্ধ,
মুগ্ধ করে সারা বায়ুমণ্ডল,

প্রজাপতিদের অপরূপ ফুলের বাসা
পাখির সুরেলা কলতান
অগ্নি লাল কৃষ্ণচূড়ার সুগন্ধ,
মুগ্ধ করে সারা বায়ুমণ্ডল,

কোমল মেজাজে নতুন পাতা ফোটে।
কুঁড়ি এবং ফুলের একটি নকশিকাঁথা বাঁধে
নিঃশব্দে আসে বসন্তের দিন,
স্বপ্ন জাগে, আশা হয় অমলিন।

দেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যার্তদের পাশে সিদীপ

যখন স্মরণকালের ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় দেশের পূর্বাঞ্চল তথা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, চাঁদপুর, লাকসাম, লক্ষ্মীপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্লাবিত হয়ে ঘর-বাড়ি তলিয়ে গিয়ে মানুষ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে । তখন সারা দেশের মানুষ নানাভাবে বন্যার্তদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। কেউ শুকনো খাবার নিয়ে ছুটে গেছে বন্যা কবলিত এলাকায় তো কেউ নৌকা নিয়ে বন্যায় আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করতে ছুটে গিয়েছে, আবার কেউ কেউ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে শুরু করেছে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প বা ব্যবস্থা করছে আশ্রিত মানুষের জন্য রান্না করা খাবারের। জাতীয় এ মহা সংকটের সময় সময় মানবতার তরে সিদীপও হাত বাড়িয়েছে সে সকল মানুষের প্রতি। বন্যাদুর্গত এলাকার বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে সিদীপ স্বাস্থ্য কর্মসূচির একটি টিম ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ বিতরণ করে দুর্গতদের সুস্থতা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। ২৮শে আগষ্ট ২০২৪ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সিদীপের পক্ষ থেকে বন্যা দুর্গত ৫টি জেলার মোট ২৪টি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ৪,৫৮১ জন রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও প্রায় ২,৪০,০০০ টাকার ওষুধ সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও সিদীপের মাঠপর্যায়ে ৩টি জোনের কর্মীরা সিদীপের পক্ষ থেকে বন্যার্তদের মাঝে উপহারস্বরূপ ৫০,০০০ পিস পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট(হ্যালোট্যাব), ১,০০,০০০ পিস ওরস্যালাইন, ৫,০০০টি সাবান, ১২০টি শাড়ি, ১২০টি লুঙ্গি, ৬১০টি গামছা এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ৩,০০০টি স্যানিটারি প্যাড পৌঁছে দেয় । বন্যা দুর্গত এলাকায় সিদীপের মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা নিজেরা বন্যায় আক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও মানবতার টানে মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে উক্ত বন্যায় সিদীপের চারটি জোনে ৬২টি ব্রাঞ্চের কর্ম এলাকার প্রায় ৬৯,৪০৭ জন গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।

এসএমএপি লোনে ঘুরে দাঁড়ালো নওপাড়ার লিপি বেগম

কিশোর কুমার

মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কলমা ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামের হত দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু লিপি বেগম। স্বামী মো. বর ঢালি। সংসারে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কাটতো তাদের জীবন। যদিও ১ বিঘা জমি আছে, কিন্তু টাকা না থাকায় জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তাই স্বামী প্রায় সারা বছর অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করে এবং অল্প কিছুদিন নিজের জমিতে কাজ করে। তবে সব সময় কাজ না থাকায় সংসার চালানো কঠিন হয়ে পরে।

এছাড়া আছে ১টা বাছুরসহ গাভী। বাছুর জন্মানোর পর সেই গাভী থেকে প্রতিদিন প্রায় ১-১.৫ লিটার দুধ পাওয়া যায় এবং দুধ বিক্রয় করে প্রতিদিন প্রায় ৮০ টাকা আয় হয়। এভাবেই চলে লিপি বেগম ও স্বামী মো. বর ঢালির সংসার।

লিপি বেগমের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। স্বামী-স্ত্রী ও তিন সন্তান (২ মেয়ে ও ১ ছেলে)। বড় ছেলেকে টাকার অভাবে লেখা পড়া করাতে পারেননি এবং দ্বিতীয় মেয়েকে নবম শ্রেণিতে লেখাপড়া করিয়ে টাকার অভাবে আর লেখাপড়া করাতে পারেননি ও ছোট মেয়েকে স্কুলে লেখাপড়া করাচ্ছেন। দিনরাত স্বামী-স্ত্রী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও সংসারের অভাব দূর হয়না।

পাড়া প্রতিবেশীর নিকট থেকে লিপি বেগম জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা দরিদ্র প্ররিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতি মাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরও এক ধরনের ঋণ দেয় যার কিস্তি ৬ মাস বা ১ বছর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে এবং তার মধ্যে এ ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়টি লিপি বেগম তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন এবং ঋণের টাকা দিয়ে তাদের জমিতে সবজি চাষ এবং আরও জমি বৃদ্ধি করে সেই জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব এবং লাভবান হওয়া সম্ভব বলে তার স্বামীকে জানান। স্ত্রীর চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত বলে স্বামী মো. বর ঢালি স্ত্রীর কথায় সম্মত হয় এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তারপর লিপি বেগম সিদীপের সদস্যদের মাধ্যমে সিদীপের সদস্যপদ লাভ করেন এবং এক মাস পর সবজি চাষ প্রকল্পে ২৪০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণ মঞ্জুর হয় এবং ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার জমিতে শিম, লাউ, ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো এবং বেগুন চাষ করেন। ৬ মাসে লিপি বেগম তার সবজি ক্ষেত থেকে সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ৪০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন এবং আন্যান্য সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় ২০,০০০

বেগমের অনেক লাভ হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হন এবং একই জমিতে কিভাবে চক্রাকারে ফসল ফলানো যায় সে জ্ঞান লাভ করেন।

জমি বন্ধক নেওয়ার পর তিনি সিদীপ থেকে এসএমএপি এর ঋণ ২০,০০০ ও অন্যান্য খাতের ঋণ ৭০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এই দুই ধরনের ঋণের টাকা ও সবজি বিক্রয়ের লাভের টাকা দিয়ে তিনি মোট ৪ বিঘা জমিতে সবজি চাষ করেন। তার এই সবজিক্ষেত থেকে এখন প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৫০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে তার সবজিক্ষেতে খরচ হয় প্রায় ১৫০০ টাকা এবং লাভ হয় প্রায় ৩৫০০ টাকা। তিনি আশা করছেন সবজি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করার পরও তা মূলধন হিসাবে বন্ধক নেওয়া জমি এবং কিছু নগদ টাকা থেকে যাবে।

লিপি বেগম আরও জানান যে, তার সবজি ক্ষেতের কোন সমস্যা হলে ব্লক সুপারভাইজার ও সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পশু ও কৃষি কল সেন্টার নাম্বারের ব্যবহার, বিভিন্ন পশু ও কৃষি সমস্যা সমাধান সম্বলিত মোবাইল এ্যাপস এর ব্যবহার ও উপকারিতা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেছেন।

আবার, লিপি বেগম তার আগের টিনের বেড়ার ঘর ভেঙ্গে ইটের বাড়ি তৈরী করবেন বলে স্বপ্ন দেখছেন এবং স্বামী সন্তান নিয়ে তিনি এখন সুখেই সংসার করছেন। বর্তমানে তার দারিদ্র্য ঘুচে গেছে। বড় ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছেন, মেজো মেয়েকে বিয়ে করিয়েছেন এবং ছোট মেয়েকে লেখা-পড়ার জন্য স্কুলে ভালো ভাবে পাঠানো শুরু করেছেন।

লিপি বেগম জানান যে, পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। তবে তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা তৈরী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দরকার। সাফল্য অর্জন করতে কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প কোন কিছু নেই, লিপি বেগম তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি)
মাইজদী ব্রাঞ্চ

Inauguration of Digital Management of Muhammad Yahiya Library ও শিক্ষালোক নতুন সংখ্যা পরিচিতি অনুষ্ঠান

৩ জুলাই ২০২৪ বিকাল ৩টায় সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো Inauguration of Digital Management of Muhammad Yahiya Library ও শিক্ষালোক নতুন সংখ্যা পরিচিতি অনুষ্ঠান। এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব মো. আশরাফুল হক ও এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার জনাব মো. মনসুর আলম। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে Digital Management of Muhammad Yahiya Library উদ্বোধন করেন জনাব মো. আশরাফুল হক ও অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। শিক্ষালোকের চলতি সংখ্যার প্রচ্ছদ সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনকে নিয়ে। তাঁর অমর রচনা 'বিষাদ সিন্ধু' থেকে অংশবিশেষ পাঠ করেন সংস্থার গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম। আলোচনা করেন জনাব মো. আশরাফুল হক ও এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার জনাব মো. মনসুর আলম। তাঁরা সংস্থার প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার দূরদর্শিতা ও বইয়ের প্রতি অনুরাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

BD Rural WASH for HCD প্রকল্পে পুরস্কার গ্রহণ

০৪ জুলাই ২০২৪ ইং তারিখে পিকেএসএফ ভবনে BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের আওতায় নভেম্বর'২৩ থেকে এপ্রিল'২৪ পর্যন্ত ৬ মাসে "Excellent Category" তে ১১টি সহযোগী সংস্থার ২০টি শাখাকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সিদীপ-এর লাকসাম ব্রাঞ্চ Excellent Category তে নির্বাচিত হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা ও লাকসাম ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব আবদুল বাছেত।

প্রকাশক: বাংলা ধরিত্রী
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১৪৮, মূল্য: ৪০০ টাকা

তোমার বাস কোথা যে: বরিশাল

নিয়াজ আহামেদ অপু

বলা যেতে পারে, বরিশালে আমার স্কুল জীবনের শুরু, ১৯৫৫ এর মাঝামাঝি। শহরের খ্রিস্টান মিশন গার্লস স্কুলে। জীবনের প্রথম স্কুল হলেও, প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারিনি। শুধু বয়স কম বলেই নয়– বালিকা হতে হবে। এখানে শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণিতে বালকদের সীমিত সুযোগ, নামটি মনে হয় 'শিশুশালা' বা 'শিশুলয়'– এখনকার দিনের প্লে-গ্রুপ। ছেলে-মেয়েরা সকাল আটটার আগেই উঁচু প্রাচীর ঘেরা স্কুলে চলে আসতো। খোলামেলা বিশাল প্রাঙ্গণ, সাজানো-গোছানো, চারদিকে ফুলের বাগান। মাঝে সবুজ টিনের ছাউনির একটি লম্বা আখড়া-ঘর, যার চারদিক খোলা। যেদিন স্কুলে ঢুকি, ভর্তির বিষয়ে আলাপ করতে, এই ঘরটি দেখতে পেয়েছিলাম। ভাবতে পারিনি, এই আখড়া-ঘরটি আমাদের 'শ্রেণিকক্ষ' হতে পারে।

প্রথম দিন অফিস-ঘর থেকে, নেভি-ব্লু গাউন পরা বাঙালি-সিস্টারের সাথে 'শিশুশালায় যাবার পথে, ভয়-লজ্জা দুটোই লাগছিলো। তবে অল্পতেই সবার সাথে ভাব হয়ে গেলো। আমরা বিশ-পঁচিশ জন ছেলে-মেয়ে। সিস্টার আখড়ায় আসার সাথে সাথে সবাই দাঁড়িয়ে "সুপ্রভাত" বলি। উনিও সবাইকে "সুপ্রভাত" জানিয়ে, হাতের বাহারি বেতটির ইঙ্গিতে বসতে বলেন। আমরা 'বিলাতি মাটির' (সিমেন্ট) চকচকে কালচে মেঝেতে বসে যেতাম। সব সিস্টারই বাহারি বেত হাতে ঘুরে বেড়াতেন। বেতের যে প্রান্তে হাত রাখতেন, সেটুকু রঙ্গিন কাপড়ে মোড়ানো। বাড়িতে আমাদের শাসনের জন্য, মা যে বেত বাজার থেকে আনাতেন, তার থেকে সিস্টারের বেত একটু মোটা-রঙিন। মিশন স্কুলে যতদিন ছিলাম, কারো উপর বেতের প্রয়োগ দেখিনি। শুধু হাওয়াতে উঠা-নামা করে নির্দেশ– দিতেন শাসন দন্ড! সিস্টার গানে লিড দেয়ার সময়, সুরের তালে তালে বেতটি এদিক-সেদিক নাড়াতেন।

আমার বড় তিন বোন বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, তখন এর নাম ছিল 'বরিশাল সদর গার্লস হাই স্কুল'। জেলার মেয়েদের স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। বরিশালের গৌরনদী উপজেলার বাঁজোড় গ্রামের অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৮৮৭ সালে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বাবা ব্রজ মোহন দত্ত ছিলেন কোলকাতার মেধাবী ছাত্র, অবসর প্রাপ্ত সাব-জজ। তাঁর নামেই বরিশালের বি. এম কলেজ। সম্পদশালী পরিবারটি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সেই অশ্বিনী বাবুর গড়া স্কুল থেকে বাসায় ফিরে, আপারা আমাকে নিয়ে বসলো 'মেম সাহেবদের স্কুল কেমন রে?'
'ভেতরে নাকি ফুলের বাগান?'
'বিদেশী মেম দেখলি?'
'সাদা মেমরা পড়ায়? বাংলায় কথা বলে?'

একসাথে এতো প্রশ্ন। ওদের হতাশ করে বলতে হলো 'সবগুলো ক্লাসই এক দেশী মেম নিলো। তবে বেশি পড়াশুনা নাই, গান-কবিতা-খেলাধুলা আর ঘুমানো।' ওরা যেনো আকাশ থেকে পড়লো, 'ঘুম! ও মা! স্কুলে ঘুম পাড়ায়!'

স্কুল থেকে দেয়া টিফিন খাওয়ার পর, কিছুক্ষণ আখড়ার মেঝেতে হাত-পা সোজা করে শুয়ে থাকতে হয়। 'কথা বলা' বা 'চোখ খোলা' যাবে না। একপাশে ছেলেরা, আরেক পাশে মেয়েরা, মাঝ দিয়ে সিস্টার মেম বেত নিয়ে পায়চারি করেন। কেউ যদি আরেকজনকে চিমটি কাটে বা ফিক্ করে হেসে উঠে, সিস্টার তাকে বেত দিয়ে খোঁচা দেন মাত্র, মারেন না।

'আজকে কি গান গাইলি?'

'ও তোমরা বুঝবা না, খুব কঠিন গান। হাত-তালি দিয়ে দিয়ে গাইতে হয়।'

‘প্রথম লাইনটা কি... “পাকিস্তান জিন্দাবাদ?”

‘না না, ঐ সব না...“আনন্দ আলো” ...তারপর কি যেনো.....কঠিন কঠিন সব শব্দ।’

আমার কথা শেষ হবার আগেই, তিন বোন একসাথে সুর করে সেই গানটিই গাইতে লাগলো! অবাক হয়ে গেলাম, ‘তোমরা কি করে জানলে আমার সিস্টারের গান?’

‘আরে বোকা, এটা তোর মেমের গান না- রবীন্দ্র সঙ্গীত। গা, আমাদের সাথে গা।’

“আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর...”

বাবার অফিসের একজন পুলিশ কনস্টেবল, আমাকে মিশন স্কুলে ভর্তির জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সাইকেলের সামনের রডে বসিয়ে। আজ আর সেই পুলিশ কাকুর নামটি মনে নেই। সেই সময়ে, কনস্টেবল আর তাঁদের দল-নেতা হাবিলদার, খাকি হাফ-পেন্ট পড়তেন– বৃটিশ রীতি। পার্থক্য বোঝাবার জন্য, হাবিলদার বাবুদের কাঁধের উপর দিয়ে একটি মোটা লাল চামড়ার বেল্ট কোনাকুনি ঘুরিয়ে এনে, পেন্টের বেল্টের সাথে লাগানো থাকতো। লাঠি হাতে হাবিলদার বাবুদের দেখতে বেশ পাওয়ার-ফুল মনে হতো। সাধারণ মানুষও সমীহ করতো। ঐ পুলিশ কাকু বাবার সর্বক্ষণিক সহকারী, দাপ্তরিক পদবি ‘আর্দালি’। তিনি ফাইলপত্র বাসা-অফিস আনা নেয়া করেন, বাসা থেকে দুপুরের খাবার নিয়ে যান। বাবা থানা পরিদর্শনে গেলে, সেই কয়দিন সাথে থাকেন। যেখানেই যেতাম, এই দায়িত্বের কাকু আমাদের খুব আপন হয়ে যেতেন। বদলি হয়ে যাবার সময়, বেশকিছু মানুষকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হতো, ভেতরটা কেঁদে উঠতো ‘আর্দালি কাকু’র জন্য। ওনাদের কোলেপিঠেই বড়ো হয়েছি। বিদায় কালে, লঞ্চ-ঘাট বা রেলস্টেশনে, ইনি-ই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না চোখের আড়ালে চলে যান।

আম্মা ঠিক করলেন, কাকুর সাইকেলে করে আমি স্কুলে আসা-যাওয়া করবো। কিন্তু স্কুল থেকে ফেরার সময় খারাপ লাগতো। আমার বন্ধুরা গল্প করতে করতে হেঁটে হেঁটে বাসায় যাচ্ছে, আর আমি তাদের পাশ দিয়ে সাইকেল করে চলে যাচ্ছি। ওরা আমাকে দেখে ডাক দিতো। বাসা থেকে স্কুল বেশি দূরে নয়। প্রধান সড়ক থেকে ডান দিকের ছোট-রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলেই আমাদের বাসা। চারপাঁচ দিনের মধ্যে রাস্তাঘাট সব চেনা হয়ে গেলো। কিন্তু মা কি একা স্কুলে যেতে দেবেন? আপাদেরও স্কুলের ‘মাসি’ বাসা থেকে নিয়ে যান। বড়ো আপাকে বুঝালাম ‘সাইকেলের রডে যেতে ব্যথা লাগে। স্কুল তো বেশি দূরে না, আমি নিজেই আসা-যাওয়া করতে পারবো। ক্লাসের কয়েকজন আমাদের বাসার কাছেই থাকে, তাদের সাথে যাবো। তুমি আম্মাকে একটু বলো না?’

কবিগুরু শান্তি নিকেতনের পাঠশালায়, শিশুদের পাঠদান, একটি বড়ো গাছের ছায়ায় প্রচলন করেছিলেন। শুরু করেছিলেন পাশের গাঁয়ের সাঁওতাল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, তাঁদের হাতে বোনা মাদুরে বসে। বৃষ্টি-বাদলে শিশুরা পাশের মাটির ঘরে চলে যেতো। আজ ভাবতে ভালো লাগে, বরিশালে একটি খোলা আখড়ায় ছোটবেলায় পড়ার সুযোগ হয়েছিলো। বৃষ্টি-বাদলে আমাদের পাঠদানও হতো একটি রুমে। তখন স্কুল ঘরে পড়তে না পারার যে খেদ ছিল আজ তা মহামূল্যে কেনা স্মৃতি। ১৯৭০ দশকের শেষদিকে শান্তি নিকেতনে প্রথম এসে জেনেছি, বোলপুর শহরের অবস্থাপন্ন পরিবারের শিশুরাও কবিগুরুর পাঠশালায় আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তার সন্তানরাও। সাঁওতাল শিশুদের সাথে এক মাদুরে বসে লেখাপড়া করে। তারপরও অনেকবার এসেছি। ২০১৯ সালে এসে মনে হলো পাঠশালাটি তেমনি-ই আছে ঠিকই, তবে অনেকটাই যেনো কালের সাক্ষী হয়ে। নতুন শতাব্দীর, নতুন বাস্তবতা।

ধারণা করা হয়, লবিং ছাড়া বর্তমান দুনিয়ায় কিছুই হয় না। বড় বড় রাষ্ট্রীয় সমস্যা, কিংবা ব্যক্তি প্রয়োজনে কোনো প্রাপ্তি– লবিং এজেন্ট সহজে সমাধান এনে দেয়। উন্নত বিশ্বে এটি অনুমোদিত পেশা। আমাদের দেশে, অর্থের বিনিময়ে লবিং মানে– দালালি ব্যবসা! অনেকে আছেন অপেশাদার, যারা এ কাজকে পরোপকার হিসাবে দেখেন। সাতষট্টি বছর আগে বড় আপার লবিং, দুদিনের মধ্যেই আম্মুর অনুমতি পেলাম। আমাকে আর পায় কে? এখন থেকে সহপাঠীদের সাথে স্কুলে যাবো! যেনো একদিনেই, অনেক বড়ো হয়ে গেছি। বড় আপার এতো বড়ো উপকারে, তাঁর চুলে তেল দিয়ে বেণী করা, উকুন আনা– কয়েক বিকেলে করেছি। অন্য সময় হলে, কোনো খাওয়ার লোভ বা লজেন্স কেনার পয়সা না দিলে, এড়িয়ে যেতাম।

কয়েকদিন ধরে শুনছি, শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক বরিশাল আসবেন। ১৯৫৪ সালে দেশের সাধারণ নির্বাচনে তিনি ‘যুক্তফ্রন্ট’ এর নেতৃত্ব দিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সাথে আসবেন বাংলার জনপ্রিয় গায়ক আব্বাসউদ্দিন আহাম্মদ। অশ্বিনী কুমার হলে গান গাইবেন, এ খবরও সবার মুখে মুখে। তখনও দিন-তারিখ ঠিক হয়নি। বন্ধুদের সাথে স্কুলে আসা-যাওয়া করলে, কতো খবরই না পাওয়া যায়! চমক দেয়ার জন্য, বড়ো আপাকে খবরটি দিলাম। নির্লিপ্ত উত্তর ‘কবেই তো শুনেছি। আব্বাকে বলে রেখেছি, আম্মাকে

নিয়ে আমরা আব্বাসউদ্দীনের গান শুনতে যাবো।' এরই মধ্যে এতো কিছু আয়োজন, আর আমিই জানি না? এক বোন টিপ্পনি কাটলো, 'সারাদিন পাড়া বেড়িয়ে, ক্লান্ত হয়ে, এতো বড়ো একটা বাসি খবর নিয়ে এলি! আয়, এক গ্লাস লেবুর সরবত দেই।'

তখনকার দিনে, শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক মানুষের মুখে মুখে। বরিশালের মানুষের 'বাঘা বাঙালি'– সারা ভারতবর্ষের জনপ্রিয় নেতা। কোলকাতার মেয়র- চাট্টি খানি কথা! তাঁর হুঙ্কারে ইংরেজরা ভয় পেতো। গণমানুষের দাবি মানতে বাধ্য করাতেন। তিনি খুব মেধাবী, পরীক্ষায় সবসময় প্রথম হতেন। চোখের পলকে নারিকেল গাছের মাথায় উঠে, এক কাঁদি ডাব নিয়ে নামতেন। দাঁত দিয়ে নারিকেল ছিলতেন। কোলকাতায় পড়ার সময়, গ্রামের বাড়িতে এলে, যুবকদের নিয়ে গরিব কৃষকের খেতের পাকা ধান কেটে দিতেন। অবাক হয়ে এসব শুনতাম।

এই মানুষটি ভালো ভালো খাবার খেতেও পছন্দ করতেন। তাঁর খাওয়ার গল্পও মানুষের মুখে মুখে। আস্ত বড়ো বড়ো কৈ মাছ মুখে ঢুকিয়ে চিবিয়ে কাঁটাসহ খেতে পারেন, বিরাট রুই-কাতলার মাথা হাতে রেখেই খেয়ে ফেলেন, মুরগি-খাসি তো থাকবেই। সবশেষে এক হালি ফজলী আম বা কাঁঠালী-কলা খেয়ে, তবেই উঠতেন। এসব গালগপ্প নয়। অনেকের নিজ চোখে দেখার দাবি। পত্রিকায় ওনার বিশাল মুখের ছবি দেখে, মনে হতো– সম্ভব। এখন বুঝতে পারি, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শেরে-বাংলার বিশাল

ভূমিকাকে আড়াল করার জন্য, পাকিস্তানিরা হালকা বিষয়গুলোই সামনে নিয়ে এসেছিল বই-পুস্তকে।

তখনো ভারতবর্ষ ভাগ হয়নি, অবিভক্ত বাংলার নেতৃত্বের প্রশ্নে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতি বুঝিনে। ওসব দিয়ে আমি ফজলুল হককে বিচার করিনে। আমি তাঁকে বিচার করি গোটা দেশ ও জাতির স্বার্থ দিয়ে। একমাত্র ফজলুল হকই বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে বাঁচাতে পারে। সে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সাচ্চা মুসলমান। খাঁটি বাঙালিত্ব ও সাচ্চা মুসলমানিত্বের এমন সমন্বয় আমি আর দেখিনি।'

এমন মানুষটি, কয়েক দিনের মধ্যেই বরিশালে আসবেন। কোথায় থাকবেন, কোথায় খাবেন– কিছুই জানি না। তবে মনে মনে ভাবছিলাম, তাঁর খাওয়ার দৃশ্য যদি নিজ চোখে দেখতে পারতাম? আপারা তো রচনা বই পড়ে শেরে-বাংলা'র কথা বলে। আমি বলবো, সামনে থেকে দেখে আসা শেরে-বাংলাকে! ...

“

এমন মানুষটি, কয়েক দিনের মধ্যেই বরিশালে আসবেন। কোথায় থাকবেন, কোথায় খাবেন– কিছুই জানি না। তবে মনে মনে ভাবছিলাম, তাঁর খাওয়ার দৃশ্য যদি নিজ চোখে দেখতে পারতাম? আপারা তো রচনা বই পড়ে শেরে-বাংলা'র কথা বলে। আমি বলবো, সামনে থেকে দেখে আসা শেরে-বাংলাকে! ...

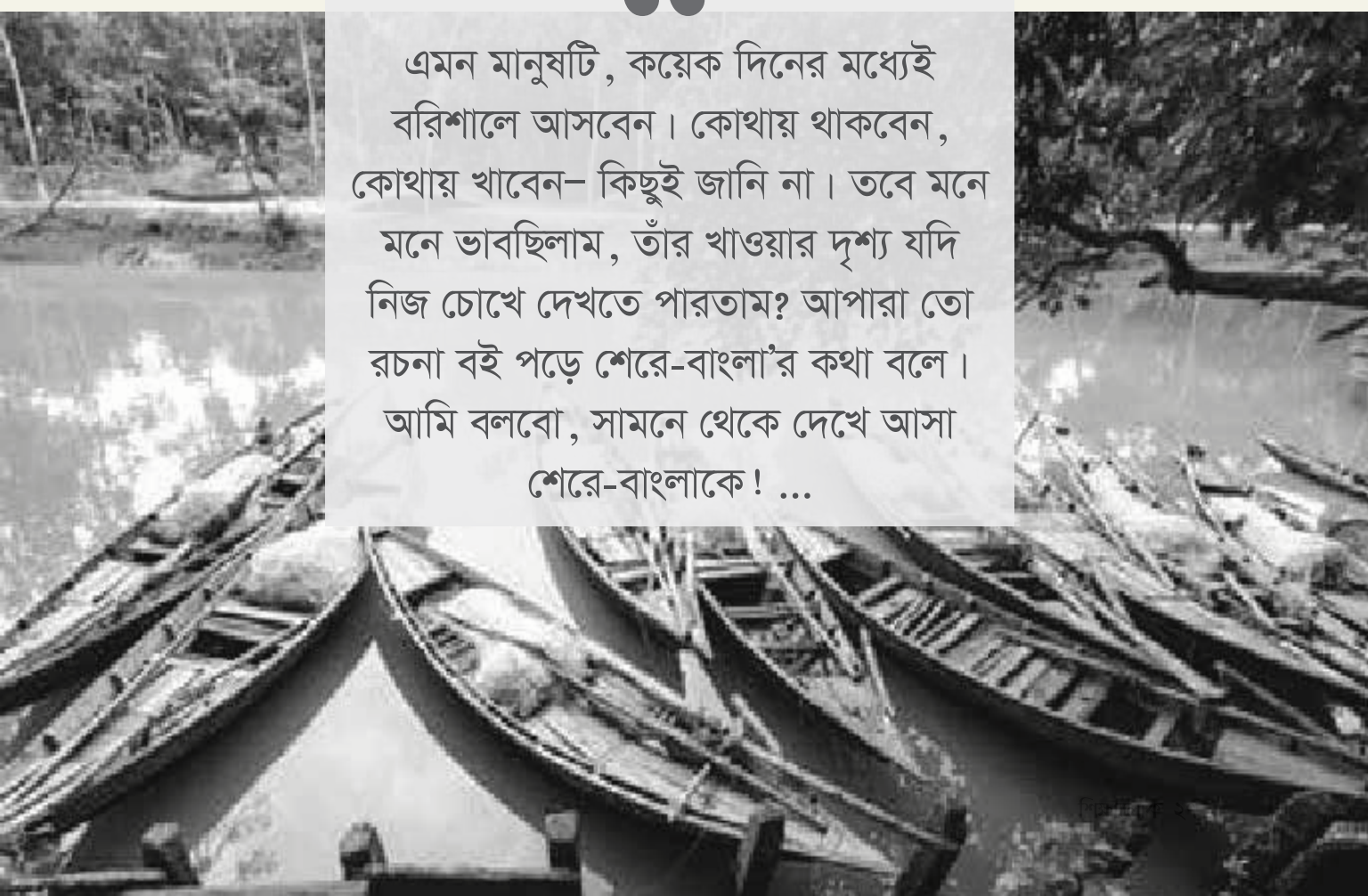

বই ও গ্রন্থাগার আগামী দুনিয়ায় আমাদের পাসপোর্ট

আলমগীর খান

বই পড়া সম্পর্কে আমাদের সমাজে একটা উন্নাসিক ভাব আছে, আর দিনকে দিন তা বাড়ছে। এমনিতেই আমাদের সমাজে বই প্রকাশ ও বই কেনার অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। তার উপর বই পড়া সম্পর্কে সমাজের অবজ্ঞামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্থিতিকে উন্নতির বদলে আরও খারাপ করছে। অবজ্ঞার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায়, এ দেশে স্কুলে মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে তাকেই মনে করা হয় যে কোনো পড়ালেখা না করেও ভাল রেজাল্ট করে। আর যে ছেলে বা মেয়ে চরম খাটুনি খেটে পড়ালেখা করে তাকে মেধাবী ভাবতে ঘোর আপত্তি থাকে সমাজে। বই পড়া সম্পর্কে সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি ছেলেমেয়েদের মনেও অনুপ্রবেশ করে। অবস্থাটি যে কেবল সমাজে বিদ্যমান তাই নয়, স্কুলকলেজের অনেক শিক্ষকও একইরকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। ফলে সেখানেও অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বাইরের বই পড়ায় নিরুৎসাহিত করেন এই বলে যে এতে ক্লাসের পড়া নষ্ট হবে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাই গ্রন্থাগার থাকলেও তা ব্যবহারে যথাযথভাবে উৎসাহিত করা হয় না। ফলে খুব কম পড়ে ভাল ফল করার মহাক্ষমতাসম্পন্ন মেধাবীরা আমাদের দেশের 'বড়' 'বড়' ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিতে পরিণত হন। এই উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠির হাতে দেশের যে হাল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অথচ আধুনিক সভ্যতার নির্মাতাই হচ্ছে বই। যদি মানুষ বই আবিষ্কার করতে না পারতো তবে মানবসভ্যতা কৃষিযুগের পূর্বেকার শিকারযুগেই আটকে থাকতো, আজকের পর্যায়ে আসার কোনো সুযোগই হতো না। কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে অবশ্য বইকে মাথার মধ্যে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রাখতে হতো। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ছিলো, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিলো কারণ এসবের গুরুত্ব সম্পর্কে সেই যুগের মানুষেরা পুরো ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেসময়ের মহান সৃষ্টির মধ্যে মহাকাব্য, ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্মৃতির বাইরে যেটুকু সম্ভব হয়েছিলো তা হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে, পাথরের ওপর ইত্যাদিতে লিখে রাখা। এরপর পশুর চামড়া, গাছের বাকল এইসব পেরিয়ে একসময় কাগজ আবিষ্কার করতে পারে মানুষ। সেই কাগজে হাতে লিখে জ্ঞান সংরক্ষণ করতে হতো। শুরুতে ছিলো এক লম্বা পাতা যা মোড়ানো থাকতো ও খুলে পড়তে হতো। কেবল একটি বই পড়ার জন্যই জ্ঞানপিপাসুকে দেশান্তর হতে, সমুদ্র পাড়ি দিতে কিংবা হাজার মাইল অতিক্রম করতে হতো। ছাপাখানা এসবকে খুব সহজ করে দিলো। জ্ঞান হয়ে উঠলো সহজলভ্য, আগের চেয়ে সস্তা ও গণতান্ত্রিক।

পৃথিবীতে এই অমূল্য জ্ঞানকে সংরক্ষণের জন্য লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে বই ছাপানোর আগে থেকেই। যে দেশ জ্ঞানবিজ্ঞানে ও সভ্যতায় যত বেশি এগিয়ে ছিলো তাদের ছিলো তত বড় বড় লাইব্রেরি। বিদেশি শত্রুরা ঐসব অনেক লাইব্রেরিকে চিরতরে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য এ ছিলো সবচেয়ে মোক্ষম উপায়। এখন লাইব্রেরি গঠন ও ব্যবস্থাপনা সে আমলের চেয়ে অনেক সহজ। কারণ বই ছাপানোর প্রযুক্তি, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি। তবু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, গর্ব করার মত আন্তর্জাতিক মানের একটি জাতীয় গ্রন্থাগার এ দেশে এখনও গড়ে ওঠেনি।

পৃথিবীতে দেশ ও জাতির ভাঙ্গাগড়া, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি রয়েছে। অতীতের অনেক পরাক্রমশালীও আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের কথা তাই আজই আমাদের ভাবতে হবে। ভবিষ্যতের ক্রোড়ে আমাদের অবস্থানকে নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই জ্ঞানচর্চায় সৃষ্টিশীল হতে হবে। গ্রন্থাগারের ভূমিকা হবে সেক্ষেত্রে খুবই অপরিহার্য।

একদিকে যেমন অন্তত একটি হলেও উন্নত জাতীয় গ্রন্থাগার গঠন আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজন, অন্যদিকে একইসঙ্গে প্রয়োজন পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, গাঁয়ে গাঁয়ে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠাগার তৈরি। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় সব ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ আমাদের সমাজে যেটুকু আছে, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সেই তুলনায় আশানুরূপ নয়।

বলা হচ্ছে আগামী দিনের সমাজ হতে যাচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক। সেই সমাজ ও কালের উল্লেখযোগ্য গর্বিত বাসিন্দা হতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই জাতীয় পর্যায়ে ছাড়াও ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। কেবল বই ও গ্রন্থাগারই হতে পারে আগামী দুনিয়ায় আমাদের পাসপোর্ট।

বন্যার্তদের পাশে সিদীপ

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার নিয়ে
প্রামাণ্যচিত্র "আলোর যাত্রী হই" এর চিত্রগ্রহণ

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

Shikkhalok
(a CDIP education bulletin)
11th year 3rd issue, July-September 2024